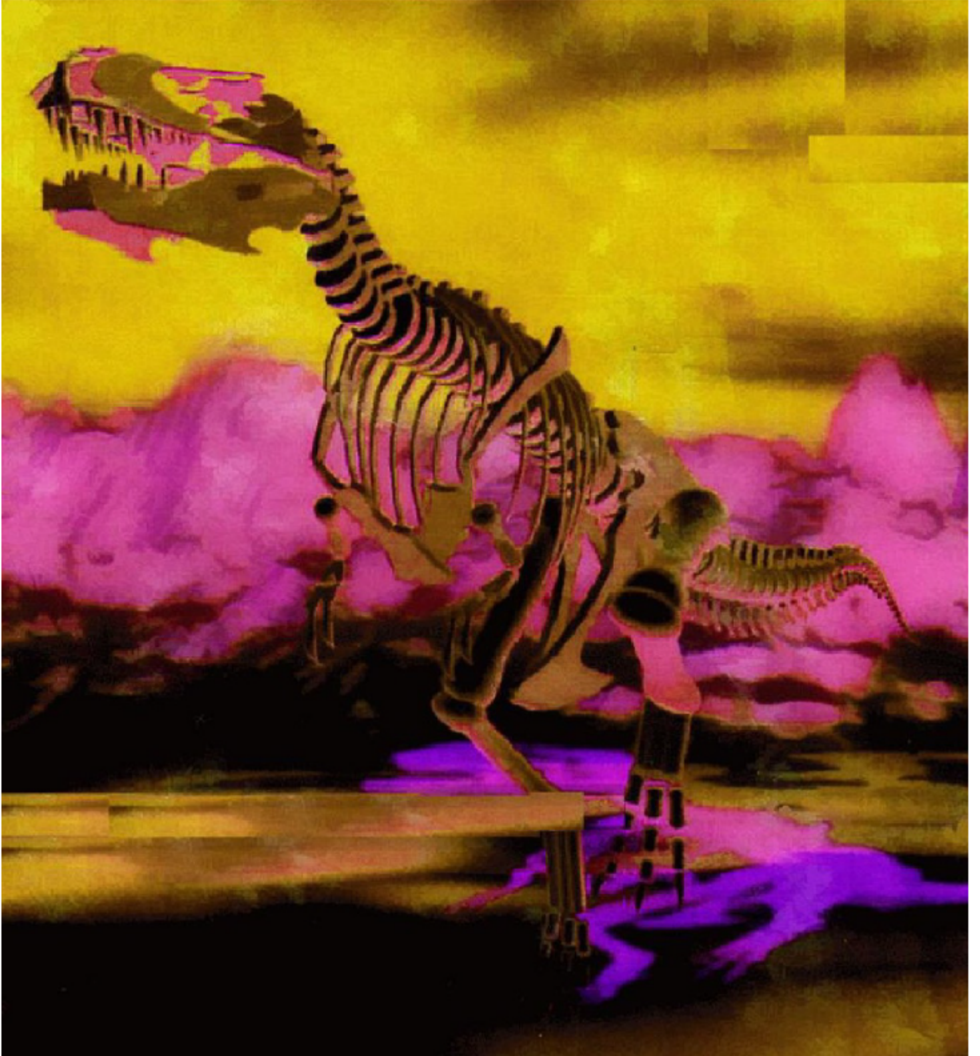
দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড

কোটিপতি জন হ্যামণ্ডের স্বপ্নের জুরাসিক পার্ক ধ্বংস হয়ে যাবার পরে ছটি বছর কেটে গেছে। সবাই জানে জুরাসিক পার্কে ডাইনোসরদের অস্তিত্ব বলে কিছু নেই। আসলে কি তাই?

লোকে বলে ওই পার্কে এখনও নাকি কিছু একটা বেঁচে আছে...



উৎসর্গ

আমার বাসার সামনের ফ্যাক্স-ফোনের দোকানী
আমাকে বিশেষ একটি নাম্বারে ফোন করতে দেখলেই
খুশি হয়ে ওঠে মোটা 'বাণিজ্যে'র আশায়।
যাঁর সঙ্গে কথা শুরু করলে গল্প আর ফুরোয় না,
সেই মানুষটির নাম—

হাসান খুরশীদ রুমী

সান্তা ফে ইন্সটিটিউট। ক্যাওস থিওরীর (পৃথিবী সৃষ্টির আগে বিশৃংখল অবস্থা ছিল - এই মতবাদ) ওপর দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে হলরুম থেকে বেরিয়ে এল আয়ান ম্যালকম। ম্যালকমের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বিশ্বখ্যাত এই ডাইনোসর বিজ্ঞানী এবং অঙ্ক শাস্ত্রবিদটির ক্যাওস থিওরী সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান সর্বজনবিদিত। বেশ কিছুদিন আগে একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর গবেষণা করতে কোস্টারিকা গিয়েছিল ম্যালকম। সেখানে অজ্ঞাত এক দুর্ঘটনায় (ঘটনাটি সম্পর্কে ম্যালকম কখনো মুখ খোলেনি) ভয়াবহ আহত হয় সে। প্রায় মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে গিয়েছিল ম্যালকম। চিকিৎসকদের অক্লান্ত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয় সে।

এই মুহূর্তে ম্যালকমের পরণে কালো স্যুট, হাতে একটা ছড়ি নিয়ে সারাহ হার্ডিং-এর পাশাপাশি হাঁটছে। সারাহ একজন ফিল্ড বায়োলজিস্ট, সম্প্রতি ফিরেছে আফ্রিকা থেকে। ওখানে সিংহ আর হায়েনাদের মত হিংস্র জীবজন্তু নিয়ে গবেষণা করে সে। ম্যালকমের সাথে তার পরিচয় অনেক দিনের। বার্কিলেতে সারাহ যখন ডক্টরেট করছে, তখন তার থিসিস পড়ার দায়িত্ব বর্তেছিল আয়ান ম্যালকমের ওপর।

সুদর্শন ম্যালকমের পাশে সুন্দরী সারাহ্কে বেশ মানিয়ে গেছে। সুগঠিত শরীর সারাহ্র, শর্টস এবং টিশার্ট পরে আছে গরমের মধ্যে। কালো, খাটো চুলগুলো কপালের ওপর থেকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে রেখেছে সানগ্লাসের সাহায্যে। আগামীকাল সারাহ্'র নাইরোবি ফিরে যাওয়ার কথা।

ম্যালকমের সাথে সারাহ্র ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায় সেই দুর্ঘটনার পর থেকে। অসুস্থ ম্যালকমকে সেবা-যত্ন করে সারিয়ে তোলার পেছনে সারাহ্র অবদান কম নয়। সবাই ভেবেছিল ব্যাচেলর ম্যালকমের প্রেমে পড়ে গেছে সারাহ। কিন্তু দুজনের সম্পর্ক সেরকম কিছুতে মোড় নেয়ার আগেই সারাহ্কে ফিরে যেতে হয় আফ্রিকায়, আর ম্যালকম চলে আসে সান্তা-ফে-তে।

আয়ান ম্যালকমের লেকচারের বিষয়বস্তুর শেষাংশ নিয়ে আলোচনা করছিল ওরা। ম্যালকমের মতে, পৃথিবী থেকে ডাইনোসররা হারিয়ে গেছে অনেক আগে। কিন্তু রিচার্ড লেভিন নামের এক একগুঁয়ে শ্রোতা ম্যালকমের যুক্তি মানতে রাজি নয়। তার ধারণা, ডাইনোসরদের বিলুপ্তি ঘটেনি। তারা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও এই মুহূর্তে দোর্দন্ডপ্রতাপে রাজত্ব করে চলেছে। কিন্তু ম্যালকম সঙ্গত কারণেই তা মানতে রাজি হয়নি। ফলে দু'জনের মধ্যে উষ্ণ বাদানুবাদ ম্যালকমের বক্তৃতার মসৃণ গতিকে খানিকক্ষণের জন্য ব্যাহত করেছিল।

'ঐ লোকটাকে চেনো তুমি?' জিজ্ঞেস করল ম্যালকম।

' কে রিচার্ড লেভিন?' হাসল সারাহ্। 'ওকে কে না চেনে? খেয়ালী বড়লোক। সব কিছুতে নাক গলানোর বদভ্যাস আছে লোকটার। তুমি বেকি ডলসের নাম শুনেছ?'

'না।'

'আমেরিকার প্রতিটি বাচ্চা মেয়ে বেকি ডলসের কথা জানে। বেকি স্যালী এবং ফ্রান্সিস

হলো তিনটে পুতুলের নাম। এই সিরিজের পুতুল প্রতিটি আমেরিকানের ঘরে তুমি পাবে। লেভিন এই পুতুল নির্মাতা কোম্পানির মালিক। কাজেই টাকার জোরে সে ধরাকে সরা জ্ঞানতো করবেই।"

মাথা ঝাঁকাল ম্যালকম। 'লাঞ্চ করবে আমার সঙ্গে?"

'অবশ্যই। আমি---'

'ডঃ ম্যালকম! দাঁড়ান! প্লীজ! ডঃ ম্যালকম?'

ঘুরে দাঁড়াল আয়ান ম্যালকম। হনহন করে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে রিচার্ড লেভিন।

'ধ্যাত্তেরি' বিরক্ত হল ম্যালকম।

'ডঃ ম্যালকম,' দূর থেকে জোর গলায় আবার ডাকল লেভিন, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেননি ভেবে এখনো অবাক লাগছে।'

'বিশ্বাস করব কি করে?' বলল ম্যালকম। 'এতো অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

' বুঝলাম। তবে –'

'মিস হার্ডিং আর আমি লাঞ্চ করতে যাচ্ছিলাম, সারাহ্'র দিকে ইঙ্গিত করল ম্যালকম।

'ঠিক আছে, যান। তবে আমার মনে হয় আমার ব্যাপারটা আপনার আরেকবার ভেবে দেখা উচিত', হাঁটার সময় গায়ের সাথে প্রায় লেগে থাকল রিচার্ড লেভিন।

'আমার ধারণা আমি অযৌক্তিক কিছু বলিনি। ডাইনোসররা বেঁচে আছে এখনো. রোস্টারিকায় ডাইনোসরের অস্তিত্বের কথা আপনার তো অজানা থাকার কথা নয়। শুনেছি ওখানে আপনি ছিলেন কিছুদিন।'

'ছিলাম। তবে আসল ঘটনা হলো -'

'তারপর কঙ্গোর কথাই ধরুন,' বকবক করেই চলেছে লেভিন। 'পিগমীরা ওখানে বড় আকারের সরোপড দেখেছে, এমনকি বোকাম্বুর ঘন জঙ্গলে অ্যাপাটোসারও আছে বলে শোনা গেছে। ইরিয়ান জায়ারের গভীর জঙ্গলে গন্ডার আকৃতির ডাইনোসরও নাকি দেখা গেছে। ওটা সেরাটোপশিয়ান হতে পারে।

'গুজব' মন্তব্য করল ম্যালকম, ' স্রেফ গালগল্প আর গুজব। আসলে কেউ ওসব দেখেনি। কোনো ছবি নেই, প্রমাণ নেই।

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' বলল লেভিন। কোস্টারিকায় নতুন এক ধরনের প্রাণীর খবর আছে আমার কাছে। প্রায় ন'মাস আগে, তখন আমি সাইবেরিয়ায় হিমায়িত শিশু হাতি খুঁজছি, ওই সময় খবরটা পাই। বেশ বড়, গিরিগিটি আকৃতির একটা প্রাণী কোস্টারিকার জঙ্গলে মরে পড়েছিল। কিন্তু সাইবেরিয়া থেকে ফিরতে দেরি হয়ে যায় আমার।"

'তারপর কি হলো?'

'প্রাণীটার' অবশিষ্ট যা ছিল সব পুড়িয়ে ফেলা হয়।'

'তার মানে প্রমাণ বলতে কিছুই থাকেনি? ছবি-টবি বা অন্য কিছু?

না।

তা হলে ওটাও বানানো গল্প।

হতে পারে। তবে আমি বিশ্বাস করি, ওদিকে অভিযানে গেলে কিছু না কিছু চোখে পড়বেই।

ম্যালকম তেরছা দৃষ্টিতে তাকাল লেভিনের দিকে।

অভিযান? কল্পনার হারানো পৃথিবী দেখতে? কে খরচ যোগাবে শুনি?

আমি, জবাব দিল লেভিন। অভিযানের একটা খসড়া পরিকল্পনা ইতিমধ্যে আমি করেও ফেলেছি।

কিন্তু ওতে খরচ পড়বে–

খরচ যাই লাগুক পরোয়া করি না, বলল লেভিন। আমি প্রমাণ করে ছাড়ব পৃথিবীতে এখনো ডাইনোসরের অস্তিত্ব আছে।

স্রেফ কল্পনা। এদিক ও দিক মাথা নাড়ল ম্যালকম। চুপ হয়ে গেল লেভিন, তারপর সরাসরি ম্যালকমের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ডঃ ম্যালকম, আপনার আচরণ সত্যি আমাকে অবাক করছে। আপনি ডাইনোসর নিয়ে এত থিসিস লেখেন আর আমি ব্যাপারটির সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাইছি। অথচ আপনার কেমন গাছাড়া ভাব দেখছি। আমি হলে এতক্ষণে লাফিয়ে পড়তাম।

আমার লাফানোর দিন শেষ, বলল ম্যালকম।

আচ্ছা আমাকে বাদ দিয়ে না হয়, আপনি–

ডাইনোসরদের ব্যাপার আমার কোনো আগ্রহ নেই, বলল ম্যালকম।

কিন্তু অন্য সবার আছে।

আমি অন্য সবার মত নই, ছড়িতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ম্যালকম, আবার হাঁটা শুরু করল।

আচ্ছা, একটা কথা, বলল লেভিন। জানতে পারি কি আপনি কোস্টারিকায় কি করছিলেন? ওখানে নাকি বছরখানেক ছিলেন?

হাসপাতালে ছিলাম। ডাক্তাররা আমাকে ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে ছয় মাসের আগে সরানোর সাহসই পায়নি। এমনকি প্লেনে চড়ার মত অবস্থাও ছিল না।

জানি আমি, বলল লেভিন। শুনেছি মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। কিন্তু কোস্টারিকার জঙ্গলে কি করতে গিয়েছিলেন? ডাইনোসরের সন্ধানে নয়তো?

ম্যালকম লেভিনের দিকে তাকাল, সূর্যের আলোয় কুঁচকে গেল চোখের কোণ। 'না' বলল সে। আমি কোন কিছুর সন্ধানে যাইনি।

নদীর এক তীরে, গুয়াডালুপে কাফের কোনার দিকে ছোট রঙচঙে একটা টেবিল দখল করে বসে আছে ওরা তিনজন। সারাহ্ হার্ডিং বোতল থেকে করোনা পান করছে আর বিপরীত দিকে বসা মানুষ দু'জনকে লক্ষ্য করছে। ওদের সাথে আসতে পেরে লেভিন খুব আনন্দিত, বোঝা যাচ্ছে চেহারা দেখে। ম্যালকমকে বিরক্ত দেখাচ্ছে, যেন অপ্রয়োজনে এখানে সময় দিতে হচ্ছে তাকে।

শুনতে চান আমি কি জানি? বলল লেভিন।

শুনেছি বছর কয়েক আগে ইনজেন নামে একটি কোম্পানী জেনেটিক্যালি বেশ কিছু ডাইনোসর সৃষ্টি করে এবং ওগুলোকে কোস্টারিকার এক দ্বীপে রেখে আসে। কিন্তু দ্বীপে ভয়াবহ কোন ঘটনায় মারা যায় বেশ কিছু মানুষ। আর ডাইনোসারগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

এখন আর ব্যাপারটা নিয়ে কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। হয়তো এ ব্যাপারে কোন কথা বলা যাবেনা এমন কিছু শর্ত আগেই ছিল। আর কোস্টারিকান সরকার চায়নি ট্যুরিস্টরা ভয়ংকর কোন গুজব শুনে দ্বীপে আসা বন্ধ করে দিক। কাজেই সবাই মুখে তালা মেরে রেখেছে।

ম্যালকম লেভিনের দিকে স্থির চোখে তাকাল। আর আপনি এ কথা বিশ্বাসও করেছেন।

প্রথমে করিনি, বলল লেভিন। কিন্তু গুজবটা পাখা নেড়ে উড়তে শুরু করল। শুনেছি আপনি অ্যালান গ্রান্টসহ আরো কয়েকজন ছিলেন ঐ দ্বীপে।

অ্যালানকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি?

পিকিং-এ এক কনফারেন্সে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। কিন্তু তিনি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছেন আমার কথা। অ্যালান গ্রান্টকে তো আপনি চেনেন, তাই না?

না। তার সাথে কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লেভিন। আপনি কি বলতে চান ইনজেনের ডাইনোসরের কাহিনী স্রেফ একটা গল্প?

ঠিক তাই। আপনার কি মনে হয় জেনেটিক্যালি ডাইনোসর তৈরি সম্ভব?

বিশেষজ্ঞরা বলেছেন সম্ভব নয়।

তাঁরা ঠিকই বলেছেন, বলল ম্যালকম। সায় পেতে সারাহ্‌র দিকে তাকাল। সারাহ্‌ বলল না কিছুই, নীরবে বিয়ার খেতে লাগল।

আসলে সারাহ্‌ ডাইনোসরের গল্প সম্পর্কে লেভিনের চেয়ে বেশি জানে। একবার এক অপারেশনের পরে, জ্বরের ঘোরে ম্যালকম বিড়বিড় করে কিছু ডাইনোসরের নাম উচ্চারণ করেছিল। সারাহ্‌ নার্সকে এর কারণ জানতে চাইলে সে বলে এ নাকি নতুন কিছু নয়, প্রতিবার অপারেশনের পর এরকম করেছে ম্যালকম। ডাক্তারের ধারণা, শরীরে ড্রাগ পুশ করার কারণে এক ধরনের ফ্যান্টাসীতে ভুগছে ম্যালকম– তবে সারাহ্‌র মনে হয়েছে ম্যালকমের জীবনে ভয়াবহ কিছু একটা ঘটেছে যা ডাইনোসরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ জন্য জ্বরের ঘোরে সে কোটি বছর আগের প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীগুলোর নাম বারবার বলছে। ম্যালকম 'র‍্যাপ্টর' 'কম্পিজ' 'ট্রাইকস' জাতীয় শব্দগুলো প্রায়ই উচ্চারণ করছিল।

পরে, ম্যালকম বাড়ি ফিরলে সারাহ্‌ জানতে চেয়েছে আসলে ঘটনাটা কি। শ্রাগ করে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে ম্যালকম। তারপর বলেছে ছেলেবেলায় ডাইনোসর নিয়ে সে খুব মাতামাতি করেছে। অসুখের সময়, অচেতনভাবে সেসব কথাই সে নিশ্চয়ই বলে ফেলেছে। সারাহ্‌ও আর কিছু জানতে চেয়ে বাড়াবাড়ি করেনি। আর আজ, ম্যালকম ডাইনোসর নিয়ে যখন সারাহ্‌র সমর্থন চাইল, বছর খানেক আগের ঘটনাটা মনে পড়লেও চুপ হয়ে থাকল সারাহ্‌। খামাখা ম্যালকমকে বিব্রত করতে চায় না সে। ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়ার পেছনে সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে। তবে ম্যালকম প্রয়োজন হলে পরে নিজেই সারাহ্‌কে বলবে।

লেভিন ম্যালকমের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, তাহলে ইনজেন কম্পানির গল্প পুরোটাই মিথ্যা?

পুরোটাই মিথ্যা, গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল ম্যালকম। পুরোটাই মিথ্যা।

আয়ান ম্যালকম রিচার্ড লেভিনের কাছে চেপে গেছে অনেক কিছুই। আসলে '৮৯-তে

সে পালো আটো'র ইন্টারন্যাশনাল জেনেটিক টেকনোলজিস-এর একজন কনসালটেন্ট ছিল। সে ঐ কোম্পানীর হয়ে ঐ সময় কোস্টারিকায় এসেওছিল। এখন অবশ্য কোম্পানীটির চিহ্নও নেই, ধ্বংস হয়ে গেছে সব। যারা এই কোম্পানীর সাথে জড়িত ছিল, পরবর্তীতে তারা সবাই এ ব্যাপারে একেবারে চুপ হয়ে গেছে। ইনজেন চায়নি কেউ মুখ খুলুক। ওদিকে কোস্টারিয়ান সরকার দেশটার 'ট্যুরিস্টদের স্বর্গ' বলে খ্যাতিটা নষ্ট হতে দিতে চায়নি। আর বিজ্ঞানীরা, যাঁরা গবেষণার সঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন, মুখ না খোলার ব্যাপারে চুক্তিতে সই করে প্রত্যেকে মোটা অংকের চেক পেয়েছিলেন। ম্যালকমকে দু'বছর হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়। তার চিকিৎসা খরচের বকেয়া পুরোটাই ইনজেন শোধ করেছে।

ইতিমধ্যে, কোস্টারিকায় ইনজেনের আইল্যান্ড ফ্যাসিলিটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দ্বীপে জ্যান্ত কোনো প্রাণীর বিচরণ ছিল না। ইনজেন স্ট্যানফোর্ডের বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী প্রফেসর জর্জ ব্যাসলটনকে ভাড়া করে। তিনি বিভিন্ন সেমিনার এবং টিভি অনুষ্ঠানে বিরতিহীনভাবে দ্বীপে ডাইনোসরের অস্তিত্ব থাকার কথা 'গুজব' বলে উড়িয়ে দিতে থাকেন। বলেন তিনি নিজেও বেশ ক'বার কোস্টারিয়ার দ্বীপে গিয়েছেন। কিন্তু ডাইনোসরের 'ড'ও নাকি তার চোখে পড়েনি।

এভাবে সময় বয়ে যায়, ডাইনোসর নিয়ে মানুষের উৎসাহ ও ক্রমশঃ কমতে থাকে। ইনজেনকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করা হয়। এক কথায় ইনজেন নিয়ে সব গুজব গুঞ্জনের অবসান ঘটে।

কাজেই নতুন করে কিছু বলার নেই।

তাহলে পুরো ব্যাপারটাই আপনি বলছেন ভুয়া? ম্যালকমকে বলল রিচার্ড লেভিন। কিন্তু ডঃ ম্যালকম, ইয়েলে আমার এক জীববিজ্ঞানী বন্ধু আছে। সে কোস্টারিকায় কিছু ডাইনোসর দেখে এসেছে। আমি তার কথা অবিশ্বাস করিনি।

শ্রাগ করল ম্যালকম। আমার বিশ্বাস হয় না, বলল সে, কোস্টারিকায় এ ধরনের কোনো প্রাণী থাকতে পারে না।

বছর খানেক ধরে অবশ্য ছিল না। তবে ওদের আবার দেখা মিললে আমি সেখানে যাব। অবশ্য শিগগিরই অভিযানে বেরিয়ে পড়ার প্ল্যানও করে রেখেছি। কিভাবে কি করব তাও প্রায় ঠিকঠাক। সবার আগে এই অভিযানের জন্য উপযুক্ত একটা গাড়ি বানাতে হবে। সে জন্য ডঃ থর্নের সাথে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরেও রেখেছি। তারপর একটা দল গঠন করব, ইচ্ছে করলে ডঃ হার্ডিও সে দলে থাকতে পারবেন। নেব কিছু প্রকৃতিবিদ, জনাকয়েক গ্রাজুয়েট ছাত্র ....

ম্যালকম লেভিনের কথা শুনতে শুনতে মাথা নাড়ছিল। ভ্রু কুঁচকে লেভিন জিজ্ঞেস করল, আপনার ধারণা আমি বেহুদা সময় নষ্ট করছি?

আমার তাই ধারণা।

কিন্তু সাপোজ– সাপোজ মনে করেন ডাইনোসরের যদি সন্ধান মেলে, তাহলে?

তা কোনদিনই মিলবে না।

মিললই যদি? আপনি আমাদের দলে আসবেন? অভিযানে অংশ নেবেন?

ম্যালকমের খাওয়া শেষ হয়েছে। প্লেটটা একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিল, তাকাল লেভিনের দিকে। তারপর বলল, হ্যাঁ ডাইনোসরদের সন্ধান মিললে আমি আপনার দলে যোগ দেব।

দারুণ! খুশি হলো লেভিন। আমি আপনার কাছ থেকে এমন জবাবই আশা করেছিলাম।

দুই

শেষ বিকেলের ফিকে রোদ গায়ে মেখে বিরাট যান্ত্রিক ফড়িংটা উপকূলের প্রায় কোল ঘেঁষে উড়ে চলেছে। এখানে সাগর এসে মিশেছে ঘন জঙ্গলের সাথে। শেষ জেলে গ্রামটাকে হেলিকপ্টার পেছনে ফেলে এসেছে মিনিট দশেক আগে। এখন সামনে শুধু দুর্ভেদ্য কোস্টারিকান বনভূমি, ম্যানগ্রোভের জলাভূমি আর মাইলের পর মাইল জনশূন্য মালভূমি। পাইলটের পাশে বসে আছেন মার্টি গুইটিরেজ, জানালা দিয়ে দেখছে ক্রমশ অপসৃয়মান তটরেখা।

গুইটিরেজ একজন আমেরিকান, বয়স বত্রিশ, গত আট বছর ধরে কোস্টারিকায় ফিল্ড বায়োলজিস্ট হিসেবে আছে। টুকান পাখিদের ওপর গবেষণার জন্য মূলতঃ এলেও সে বর্তমানে উত্তরের ন্যাশনাল পার্ক রিজার্ভ বায়োলজিক ডি কাররার কনসালট্যান্টের দায়িত্ব পালন করছে। রেডিও মাইকের সুইচ অন করে গুইটিরেজ পাইলটকে জিজ্ঞেস করল, 'আর কত দূর?'

'পাঁচ মিনিট, সিনর গুইটিরেজ।'

গুইটিরেজ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, আর বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু কপ্টারের পেছনের সিটে বসা লম্বা লোকটি কোনো মন্তব্য করল না। থুতনিতে হাত রেখে গভীর মনোযোগের সাথে সে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

লম্বা লোকটির নাম রিচার্ড লেভিন। রঙ জ্বলা খাকি পোশাক পরণে তার, মাথায় অস্ট্রেলিয়ান কান ঢাকা টুপি, কপালের ওপর নামানো। তার ঘাড়ে একজোড়া পুরোনো বাইনোকিউলার ঝুলছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, ' এই জায়গাটার নাম কি?'

রোজাস।

তার মানে দক্ষিণে চলে এসেছি?

হ্যাঁ, পানামা বর্ডার এখান থেকে একশ' মাইল দূরে।

লেভিন জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল, রাস্তাঘাট তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। জিনিসটাকে ওরা দেখল কিভাবে?

নৌকায় চড়ে এসেছিল ওরা, বলল গুইটিরেজ। তীরে নামতেই ক্যাম্পার জোড়াকে চোখে পড়ে।

কবে?

গতকাল। ক্যাম্পার দুটোকে দেখেই ভয়ে পালিয়ে যায় লোকগুলো।

লেভিন মাথা ঝাঁকালো।

আগে কোন দিন কোস্টারিকায় আসনি? জানতে চাইল গুইটিরেজ।

না। এই প্রথম, বলল লেভিন। তারপর বিরক্তির ভঙ্গীতে হাত ছুঁড়ল, যেন এসব জোলো ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে আগ্রহ বোধ করছে না।

হাসল গুইটিরেজ। লেভিন এতদিনে একটুও বদলায়নি বিজ্ঞানের তুখোড় ছাত্র ছিল সে এক সময়। দু'জনে এক সাথে ইয়েল থেকে গ্রাজুয়েশন করেছে, কিন্তু জুলজীতে ডিগ্রী নেয়ার জন্য ডক্টরেট করার প্রোগ্রামটা ছেড়ে দেয় লেভিন। তারপর একদিন ঘোষণা করে তুলনামূলক প্রাণীবিদ্যার প্রতি তার আর কোনো আগ্রহ নেই। তবে গুইটিরেজ তার গবেষণা চালিয়ে যায়। লেভিন তাকে প্রায়ই ঠাট্টা করে বলত গুইটিরেজ দুনিয়া খুঁজে কাকাতুয়ার মল জোগাড়ের কাজ করছে। গুইটিরেজ হেসেছে শুধু, কোনো মন্তব্য করেনি। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী লেভিনের খেয়ালী মেজাজ আর কাঠখোট্টা স্বভাবের কথা ভালই জানা আছে তার। কিন্তু রিসার্চাররা কেউ ওকে দেখতে পারে না সব সময় হুল ফুটিয়ে কথা বলার কারণে। তবে লেভিনের খ্যাতি আছে প্যালেনটলজিস্ট হিসেবে। ডাইনোসরদের সন্ধানে সে সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছে। কোস্টারিকায় আসার আগে সে উলান বাটোর গিয়েছিল গোবি মরুভূমিতে ডাইনোসরের কঙ্কাল পাওয়া গেছে শুনে। তার বন্ধু জন রসটনের ধারণা কঙ্কালটা ভেলেসিরেপ্টর ডাইনোসরদের নতুন কোন প্রজাতি। কিন্তু ওখানে গিয়ে ফক্কা খেয়ে এসেছে লেভিন। ওটা মোটেই ডাইনোসর ছিল না। তারপর সে কোস্টারিকায় এসেছে ডাইনোসরের সন্ধান এখানেও মিলতে পারে সেই আশায়।

সিনর, পাইলট ডেকে বলল, জুয়ান ফার্নান্দেজ বে সামনে।

লেভিন প্রস্তাব দিল, আগে একটা চক্কর দিই, কি বলো?

জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল সে, চেহারায় উত্তেজনার ছাপ। পাহাড়ের মধ্যে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত জঙ্গলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে ওরা। কপ্টার নাক নিচু করল, চক্কর দিতে লাগল সাগর সৈকতকে ঘিরে।

ঐ যে ওটা। আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাল গুইটিরেজ।

সাদা ধবধবে চাঁদের মত সী বীচটা একদম খালি। দূরে, দক্ষিণ দিকে বালুর ওপর কালো একটা দাগ। আকাশ থেকে ওটাকে বড় পাথর বা সামুদ্রিক আবর্জনার স্তূপ মনে হলো। প্রায় আকৃতিহীন জিনিসটা ফুট পাঁচেক হবে চওড়ায়। চারপাশে পায়ের ছাপ।

এখানে কেউ এসেছিল? দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানতে চাইল লেভিন।

সকালে পাবলিক হেলথ সার্ভিসের লোক এসেছিল।

জিনিসটার কোনো ক্ষতি করেছে? হাতটা টাও দিয়েছে?

জানি না ঠিক, বলল গুইটিরেজ।

পাবলিক হেলথ সার্ভিস, এদিক ওদিক মাথা নাড়াল লেভিন হতাশ ভঙ্গীতে। ওরা এখানে কি চায়? এখানে ওদের আসতে দেয়া তোমার উচিত হয়নি মার্টি।

'আরে' বলল, গুইটিরেজ। আমি তো আর এই এলাকার মালিক নই। তবু আমার পক্ষে যা সম্ভব করেছি। তুমি আসার আগেই ওরা ওটাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। অনেক কষ্টে ঠেকিয়েছি। জানি না আর কতক্ষণ ওরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।

তাহলে কাজ শুরু করে দিই চলো, বলল লেভিন। মাইকের বোতামে চাপ দিল। আমরা এখনো চক্কর দিচ্ছি কেন, পাইলট? অন্ধকার হয়ে আসছে। শিগগির নিচে নামো। প্রথম সুযোগেই আমি জিনিসটাকে দেখতে চাই।

রিচার্ড লেভিন বালির ওপর দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো কালো আকৃতিটি লক্ষ্য করে, বুকের ওপর বাড়ি খেচ্ছে বাইনোকিউলার। দূর থেকেও পঁচা মাংসের বোঁটকা গন্ধ লাগছে নাকে। লাশটার শরীর অর্ধেক ডুবে আছে বালুতে, মাছিদের ঘন একটা মেঘ ঢেকে রেখেছে। গ্যাসের কারণে শুকিয়ে গেছে চামড়া, ফলে কি জাতের প্রাণী ওটা বের করা মুশকিল হয়ে পড়বে।

প্রাণীটার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়াল লেভিন, হাতে তুলে নিল ক্যামেরা। ভোজবাজির মত পাশে এসে হাজির হল পাইলট, ধরে ফেলল হাত।

নো পারমিট্রিডো।

মানে?

দুঃখিত সিনর, এখানে ছবি তোলার অনুমতি নেই।

মগের মুল্লুক নাকি? বলে গুইটিরেজের দিকে ঘুরে দাঁড়াল লেভিন। সে দুলকি চালে এদিকেই আসছে।

মার্টি, ছবি তোলা যাবে না কেন? ছবিটা একটা জরুরি-

কোনো ছবি তোলা যাবে না, আবার বলল, পাইলট, ক্যামেরাটা ছিনিয়ে নিল লেভিনের কাছ থেকে।

চোখের দেখা দেখে তৃষ্ণা মেটাও, বলল গুইটিরেজ। তারপর স্প্যানিশে কি যেন বলতে শুরু করল পাইলটের সাথে। পাইলট হাত দুলিয়ে রেগে রেগে জবাব দিল।

দাঁড়িয়ে থেকে দৃশ্যটা এক মুহূর্ত দেখল লেভিন। ওরা ঝগড়া করে মরুকগে ভেবে পা বাড়াল সে লাশটার দিকে। গন্ধটা আরো তীব্র হয়ে উঠছে। প্রাণীটা আকারে বিরাট হলেও কাছে পিঠে লাশ খেকো কোনো শকুন বা ইঁদুর চোখে পড়ল না লেভিনের। হাজার হাজার মাছি এত ঘনভাবে ঢেকে রেখেছে লাশটাকে যে শরীরের রেখা চেনাই যায় না।

তারপরও বোঝা যায় খুব শক্তিশালী প্রাণী ছিল এটা। গরু বা ঘোড়ার মতই বড়। শুকনো চামড়া সূর্যের তাপে ফেটে গেছে, ভেতরের হলুদ রঙের চর্বি বেরিয়ে পড়েছে। নাকে হাত চেপে ওটার দিকে এগুলো লেভিন।

গরুর সমান আকৃতি হলেও এটা কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী নয়। চামড়াটা লোমশূন্য। আসল রঙ বোধহয় সবুজ ছিল। গিরগিটির মত ত্বক। ঘাড়, কাঁধ এবং হিপ জয়েন্টের ভাঁজগুলো গিরগিটির সাথে মিলে যায়।

কিন্তু গিরগিটি এত বড় হয় না। কমপক্ষে একশ কেজি ওজন ছিল প্রাণীটার, অনুমান করল রিচার্ড লেভিন। একমাত্র ইন্দোনেশিয়ার কোমোডো ড্রাগনরাই এত বড় আকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু এদিকে কোনো কোমোডো ড্রাগন নেই ভাল করেই জানে লেভিন। আর এটার ঘাড় লম্বা, ডাইনোসরদের মতই। প্রাণীটা যাই হোক না কেন, অচেনা এবং খুবই দুর্লভ প্রজাতির কোনো প্রাণী হবে তাতে লেভিনের কোনই সন্দেহ নেই। যদি তাই হয় তা হলে

এটার ছবি তুলে রাখা তার অবশ্য কর্তব্য। ডকুমেন্ট হিসেবে পরে কাজে লাগবে। কিন্তু গোঁয়ার গোবিন্দ পাইলটের জন্য সে সুযোগ কোথায় লেভিনের।

হঠাৎ গোঁ গোঁ একটা আওয়াজ শুনতে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল রিচার্ড লেভিন। একটা হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে সাগর সৈকত, বালুতে গাঢ় ছায়া ফেলে। ধবধবে সাদা হেলিকপ্টারের রঙ, এক পাশে লাল অক্ষরে কি সব যেন লেখা। অস্তগামী সূর্যের আলো চোখে পড়াতে লেখাটা পড়তে পারল না লেভিন। সে আবার মনোযোগ দিল লাশের প্রতি।

লেভিন লক্ষ করল লাশটার পেছনের পা দুটো বেশ পেশীবহুল, সামনের পা থেকে একেবারে আলাদা। সম্ভবতঃ সামনের পা দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতো প্রাণীটা, ভারসাম্য রক্ষা করত পেছনের পায়ে। অনেক গিরগিটি সোজা হয়ে হাঁটে। তবে লেভিন নিশ্চিত, এটা আদৌ সেরকম কিছু নয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে অথচ কাজ পড়ে আছে অনেক। দ্রুত ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। পকেট থেকে ছুরি বের করে প্রথমে মাছি তাড়াল, তারপর উরুর কাছ থেকে খানিকটা মাংস কেটে নিল। এই সময় ওর দিকে এগিয়ে এল গুইটিরেজ।

'সরি, বলল সে পাইলট রাজি হচ্ছে না।

পাইলট গুইটিরেজের পেছন পেছন এল। তীব্র দৃষ্টি লেভিনের দিকে।

মার্টি, বলল, লেভিন, আমাকে ছবি তুলতেই হবে।

কিন্তু করার কিছু নেই, অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো গুইটিরেজ। ওকে বোঝাতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি কোনো।

লেভিন লক্ষ্য করল অদূরে সাদা হেলিকপ্টারটা ল্যাণ্ড করেছে, ইউনিফর্ম পরা লোকজন নেমে আসছে ওটার পেট থেকে।

মার্টি, ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল লেভিন, এই প্রাণীটাকে চেনা যায়?

অনুমান করতে পারি বড়জোর, বলল গুইটিরেজ। অজানা কোনো ইগুয়ানা হবে সম্ভবত। কোস্টারিকায় এ ধরণের প্রাণী কখনো দেখা যায়নি হতে পারে গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ থেকে এটা এসেছে।

'না, মার্টি, বাধা দিল লেভিন। এটা ইগুয়ানা নয়।

তাহলে গিরগিটি জাতীয় কিছু হবে।

মার্টি, এটা গিরগিটিও নয়।

চোখ পিটপিট করল গুইটিরেজ। বলছ কি তুমি? এটা অবশ্যই গিরগিটি।

অবশ্যই না, দৃঢ়কণ্ঠে বলল লেভিন।

দুঃখিত, তোমার সাথে আমি একমত হতে পারলাম না, এদিক ওদিক মাথা নাড়ল গুইটিরেজ।

ওদিকে সাদা হেলিকপ্টারের লোকজন মুখে সার্জিক্যাল মাস্ক পরা শুরু করেছে।

আমি তোমাকে একমত হতেও বলিনি, হেলিকপ্টার থেকে লাশের দিকে নজর ফেরাল লেভিন। আমরা এটার মাথা কেটে নিয়ে যাব। পরীক্ষা করলেই জানা যাবে এটার আসল পরিচয়। যেমন ধরো উরুর এই দিকটা-ছুরি দিয়ে কাটা অংশ দেখাল সে। থেমে গেল চেঁচামেচির আওয়াজে। দেখল হেলিকপ্টার থেকে লোকজন দৌড়ে আসছে তাদের দিকে,

পিঠে ট্যাঙক বাঁধা স্প্যানিশ ভাষায় কি যেন বলছে তার স্বরে।

ভ্রু কুঁচকে গেল লেভিনের। কি বলছে ওরা?

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গুইটিরেজ। এখান থেকে সরে যেতে বলছে।

সরব কেন? ওদেরকে বলো আমরা ব্যস্ত আছি। লাশের দিকে আবার ফিরল লেভিন। কিন্তু লোকগুলো হট্টগোল করতেই থাকল।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা গর্জন শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই লেভিন দেখল ওরা ফ্লেমথ্রোয়ার চালু করেছে। হিসহিস শব্দে আগুনের লকলকে শিখা বেরিয়ে আসছে কয়েকটা যন্ত্রের মুখ থেকে; আলোকিত হয়ে উঠেছে সাগর সৈকত। ফ্লেমথ্রোয়ার হাতে লোকগুলোকে লাশটার দিকে এগুতে দেখে 'না! না'! বলতে বলতে দৌড়াতে শুরু করল লেভিন।

কিন্তু লোকগুলো ওকে পাত্তাই দিল না। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করল লেভিন 'না' এটা অমূল্য একটা!

এক ইউনিফর্মধারী ঝাপটে ধরল লেভিনকে, পরক্ষণে ছুঁড়ে ফেলে দিল বালুর ওপর।

এখানে কি চাও তোমরা? হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল লেভিন। কিন্তু বাধা দেয়ার আগেই দেখল আগুনের একটা শিখা ছোবল হেনেছে লাশের গায়ে। কালো একটা ছোপ তৈরি হলো ওখানটায়, তারপর চামড়ার পকেটে জমে থাকা মিথেন গ্যাস নীল আগুন নিয়ে বিস্ফোরিত হল পটকা ফাটার শব্দে। ঘন ধোঁয়া উঠতে শুরু করলো আকাশে লাশের গা থেকে।

'থামো! থামো! লেভিন বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল গুইটিরেজের দিকে। ওদেরকে থামাও!

কিন্তু নড়ল না গুইটিরেজ, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জ্বলন্ত লাশটার দিকে। লাশটার শরীরের ওপরের অংশ ফেটে গেল আগুনের তাপে, ছিটকে পড়ল চর্বি, কালো, মসৃণ পাঁজরগুলো বেরিয়ে পড়ল আড়াল থেকে, তারপর গোটা মুখ হঠাৎ উল্টে গেল। ঘাড়ের অংশটা লাফিয়ে উঠল স্প্রিংয়ের মতো, চামড়া পুড়ে কুঁচকে যাচ্ছে, সেই সাথে নাচানাচি শুরু করল ওটা। আগুনের ভেতরে, লেভিন স্পষ্ট দেখতে পেল ওটার খাড়া নাক, এক সারি প্রাগৈতিহাসিক ধারালো দাঁত এবং ফাঁকা গর্তের মতো কোটর। গোটা আকৃতি মধ্যযুগের ড্রাগনের মত দাউ দাউ করে জ্বলতেই থাকল।

তিন

সান হোসে এয়ারপোর্টের ধারে বসে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে রিচার্ড লেভিন। অপেক্ষা করছে প্লেনের জন্য। আমেরিকায় ফিরে যাবে। তারপাশে গুইটিরেজ, চুপচাপ বসে আছে। অস্বাভাবিক একটা নীরবতা নেমে এসেছে দু'জনের মাঝে। গুইটিরেজ আড় চোখে তাকাল পায়ের কাছে রাখা লেভিনের ব্যাগটার দিকে। গাঢ় সবুজ রঙের ব্যাগটাতে অসংখ্য পকেট।

আবহাওয়া হালকা করার জন্যই যেন গুইটিরেজ বলল, বেশ সুন্দর ব্যাগতো। থর্ন কোম্পানীর মনে হচ্ছে।

ঠিক ধরেছেন, গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল লেভিন।

ওপরের ফ্ল্যাপে কি রেখেছ? জিজ্ঞেস করল গুইটিরেজ। স্যাটেলাইট ফোন? জিপিএস? নাকি অন্য কিছু?

বাজে কথা রাখো মার্টি, গম্ভীর শোনাল লেভিনের কণ্ঠ। কাজের কথায় এসো। আমাকে বলবে কি বলবে না বলো?

কি ব্যাপারে?

এখানে হচ্ছেটা কি?

শোনো, রিচার্ড -

না, বাধা দিল লেভিন। সৈকতের ঐ জিনিসটা খুব মূল্যবান ছিল। ওটাকে ধ্বংস করা হয়েছে। আমি বুঝতে পারছিনা জেনে শুনেও তুমি ওদের কেন বাধা দিলে না।

লেভিন নাছোড়বান্দা বুঝল গুইটিরেজ। হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, ঠিক আছে, তোমাকে আমি সবই বলব, কিন্তু ব্যাপারটা গোপন রাখবে, কথা দাও।

আচ্ছা, বলো?

ঘটনার শুরু বছর পাঁচেক আগে। বেশ কিছু জন্তুকে একটা প্রত্যন্ত কৃষি খামারের কাছে, পাহাড়ের ওপর প্রায়ই দেখা যাচ্ছিল। ওখানে সয়াবিন চাষ হতো।

সয়াবিন! প্রশ্ন করল লেভিন।

মাথা ঝাঁকাল গুইটিরেজ। 'দৃশ্যতঃ মনে হতো জন্তুগুলো সয়াবিন আর বিশেষ এক শ্রেণীর ঘাসের প্রতি আগ্রহী। হয়তো শরীরের অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব দূর করতো ওরা এসব খেয়ে। তবে আসল কারণটা জানত না কেউ।

কোথেকে আসত ওরা?

তাও কেউ জানত না, বলে চলল গুইটিরেজ। ওদের সবগুলোকে মেরে ফেলা হয়। যতদূর জানি পরবর্তী চার বছরে জন্তুগুলোর চিহ্নও দেখা যায়নি কোথাও। হঠাৎই গত বছর থেকে ওগুলোর আবার আবির্ভাব ঘটে। চারটে লাশ আমরা আবিস্কার করি, আজকেরটাসহ।

কি ঘটেছে ওদের ভাগ্যে? প্রশ্ন করল লেভিন।

মেরে ফেলেছে সরকার। সরকার চায়নি জানোয়ারগুলোর লাশের সন্ধান কেউ পাক। তাই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে সব লাশ।

কেন?

ভয়ে।

কিসের ভয়?

অসুখের, রিচার্ড।

অসুখের?

হ্যাঁ। কোস্টারিকায় মানুষ আসে স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায়। আর এক্ষেত্রে এই জন্তুগুলোর আবির্ভাবের সাথে সাথে গ্রামের কিছু চাষাভূষার মাঝে অজানা একটা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড মাথাব্যথা, মানসিক অবসাদ, জ্বর, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকা ইত্যাদি শুরু হয়ে যায় এক সাথে। পরীক্ষা করে জানা যায় ভাইরাস বাহিত কোনো রোগ নয় এটা। সরকার ভয় পেয়ে যায়। কারণ এ দেশটা চলে টুরিস্টদের টাকায়। তারা অজানা রোগের কারণে ভয় পেয়ে কোস্টারিকায় আসা বন্ধ করে দিলেই চিত্তির।

আর সবাই ধরে নিল অজানা রোগের জন্য দায়ী ঐ প্রাণীগুলো?

হ্যাঁ।

ওরা কোত্থেকে এসেছে জানার জন্য অনুসন্ধান চালানো হয়নি?

হয়নি আবার! গোটা দেশে চিরুনী অভিযান চলেছে। আমি নিজেও বেশ কয়েকটা সার্চ পার্টির নেতৃত্ব দিয়েছি। এমনকি ব্যক্তি মালিকানাধীন দ্বীপগুলোতেও।

এখানে ব্যক্তিমালিকানাধীন দ্বীপও আছে নাকি?

আছে কয়েকটা। যেমন ইসলা নুবলার-এটা ইনজেন নামে একটা আমেরিকান কোম্পানীর কাছে লিজ দেয়া হয়েছিল।

আর?

আরো আছে ইসলা টালামানচা, পূর্ব উপকূলে, পশ্চিম উপকূলে আছে সোরনা। এটার লিজ নিয়েছে একটা জার্মান মাইনিং কোম্পানী। আর উত্তরের মেরোজান দ্বীপটা কিনেছে কোস্টারিকার এক ধনী পরিবার। আরো দু'একটা প্রাইভেট দ্বীপ থাকতে পারে। মনে পড়ছে না এখন।

খোঁজাখুঁজি করে কি মিলল?

কিছুই না, বলল গুইটিরেজ। কাজেই ধরে নেয়া হলো জানোয়ারগুলো গভীর জঙ্গল থেকে এসেছে। তবে একটা কথা কি জানো অনেককেই দেখলাম এগুলোর প্রতি বেশ আগ্রহী।

কপালে ভাঁজ পড়ল লেভিনের। কি রকম আগ্রহ?

গত বসন্তে বার্কলে থেকে সরকারের অনুমতি নিয়ে এসেছিল একদল বোটানিস্ট। কেন্দ্রীয় মাল ভূমির গাছের ওপর জরিপ চালাবে। অথচ পরে জানাগেলো বার্কলে থেকে ওরকম কোনো সার্ভে টিমই পাঠানো হয়নি। ঘটনা জানাজানি হবার আগেই ভুয়া বোটানিস্টরা হাওয়া।'

ওদের আসল পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি?

'না। গত শীতে একদল সুইস জুলজিষ্ট এসেছিল উপকূলবর্তী দ্বীপগুলোতে গ্যাসের স্যাম্পল চেক করতে। সেন্ট্রাল আমেরিকায় অগ্নিগিরির গতি-প্রকৃতি নির্ণয় তাদের উদ্দেশ্যে। পরে দেখা গেল তারা আসলে 'বায়োসিন' নামে একটি আমেরিকান জেনেটিক্স কোম্পানীর কর্মচারী এসেছে ঐ জন্তুগুলোর খোঁজে।'

'বায়োটিক কোম্পানী এসবের প্রতি আগ্রহী হবে কেন? বলল লেভিন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

তবে বায়োসিন-এর কিন্তু কুখ্যাতি আছে অদ্ভুত সব গবেষণা করার ব্যাপারে। ওদের মালিকের নাম লুইস ডজসন।

ওঃ মনে পড়েছে, বলল লেভিন, এই লোকটাই তো চিলিতে বছর কয়েক আগে র‍্যাবিজ ভ্যাকসিন টেস্ট চালিয়ে কয়েকজন নিরীহ গ্রামবাসীকে অসুস্থ বানিয়ে ফেলেছিল।

'হ্যাঁ। সে-ই। কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত এক ধরনের আলু বাজারে ছেড়েছিল ডডসেন কাউকে না জানিয়েই। সেই আলু খেয়ে ডায়রিয়া হয়ে মারা যায় কয়েকটা বাচ্চা। তারপর হারানো ইমেজ ফিরে পেতে তাদের জর্জ ব্যাসেলটনকে ভাড়া করতে হয়।'

এই লোকটাকে দেখছি সবাই তাড়া করে, বলল লেভিন।

কাঁধ ঝাঁকাল ওইটিরেজ। বায়োলজির নাম করা অধ্যাপক সে। যাহোক, ডজসন সম্পর্কে সবাই জানে আইন ভাঙ্গার অভ্যাস আছে তার। আর সুযোগ পেলেই অন্য কোম্পানীর রিসার্চ পেপার চুরি করে।

কিন্তু কোস্টারিকায় ওদের স্বার্থটা কি? জিজ্ঞেস করল রিচার্ড লেভিন।

ঠিক জানি না আমি, বলল নুইটিরেজ। তবে বড় ধরনের কোনো স্বার্থ না থাকলে পয়সা খরচ করে না ডজসন। যাহোক, তোমাকে অনেক গোপন কথাই বললাম। আশা করি কাউকে বলবে না।

বলেইছি তো বলব না। বলল লেভিন। আজ সকালে কি দেখেছি তাও আমি ভুলে গেছি। হাসছে সে।

হাসল ওইটিরেজও। যাত্রা শুভ হোক, রিচার্ড।

ধন্যবাদ, মার্টি। ভালো থেকো।

চার

রাত দুটোর দিকে, কাটার রোডের প্রায় জনশূন্য ম্যারি ক্যালেন্ডার রেস্টুরেন্টের পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকাল জেমস এড। কালো রঙের বিএমডব্লিউ গাড়িটা প্রবেশ পথের কাছে আগেই পার্ক করা লক্ষ করল সে। জানালা দিয়ে এড জেমস দেখল ডজসন একটা বুথের ভেতরে বসে আছে। শান্ত চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। ডজসনকে কখনো ভাল মুডে থাকতে দেখেনি এড জেমস। ডজসনের পাশে বিশালদেহী এক ভদ্রলোক। লোকটির সাথে কথা বলছে ডজসন আর বারবার চোখ বুলাচ্ছে ঘড়িতে। বিশালদেহী লোকটির নাম ব্যাসেলটন। বিখ্যাত প্রফেসর, টিভিতে প্রায়ই তাঁকে দেখা যায়। ব্যাসেলটন কাছেপিঠে থাকলে এড জেমস স্বস্তি অনুভব করে। ডজসনের ক্রুর চাউনিকে সে ভয় পায়, তবে ব্যাসেলটন কোনো খারাপ কাজে জড়িত থাকতে পারেন তা কল্পনাও করতে পারে না সে।

জেমস ইগনিশন সুইচ অফ করল, রিয়ার ভিউ মিররে দেখে শার্টের কলারের বোতাম লাগাল, টাইটা টেনে বের করল। ওর মুখে দু'দিনের না কামানো দাড়ি। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। শালার কি একটা চাকরি! ভাবল সে। ক্লান্ত তো দেখাবেই।

ডজসন সব সময় মাঝরাতে মিটিং ডাকেন। আর তাও এই অগামার্কা মেরী ক্যালেন্ডার রেস্টুরেন্টে। এখানকার কফির স্বাদ বিশ্রী। মুখে তোলা যায় না। জেমস ভেবে পায় না কেন এখানেই সব সময় মিটিং ডাকে ডজসন।

ম্যানিলা খামটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে বেরুল এড জেমস, দড়াম করে বন্ধ করল দরজা। প্রবেশ পথের দিকে পা বাড়াল সে, এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে। এক হাজার চুক্তিতে, প্রতিদিন পাঁচশ ডলারের বিনিময়ে এবার কাজ করছে সে। একদল বিজ্ঞানীকে অনুসরণ করতে হবে। প্রথমে জেমস ভেবেছিল এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ ধরনের কোন কাজ হবে। পরে দেখে বিজ্ঞানীরা কেউই ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত নন; ইউনিভার্সিটিতে পড়ান সবাই, নিরস সব কাজ। একবার ডাইনোসর বিজ্ঞানী ইলেন স্যাটলারের বার্কলে-র লেকচার রুমে

লেকচার শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল জেমস। ফালতু একটা চাকরি, কিন্তু টাকার অংক মন্দ নয় বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজটা করে যাচ্ছে ও।

এড জেমস সালাম দিয়ে ডজসনদের টেবিলে গিয়ে বসল। ওয়েট্রেসকে আরেক কাপ কফি দিতে বলে সরাসরি কাজের কথায় চলে এল ডজসন।

সারারাত এখানে থাকতে পারবো না, বলল সে। শুরু করো।

অবশ্যই, বলল জেমস। খামটা খুলে কিছু কাগজ আর ছবি বের করে এগিয়ে দিল ডজসনের দিকে কথা বলার ফাঁকে।

অ্যালান গ্রান্ট ঃ মন্টানা স্টেটের ডাইনোসর বিজ্ঞানী। এখন প্যারিসে আছে। ডাইনোসরের লেটেস্ট ফসিলের আবিস্কার সম্পর্কে লেকচার দিচ্ছে। টাইরানোসরাস সম্পর্কে তার নতুন কিছু আইডিয়া-

বাদ দাও, ডজসন বাধা দিল। অন্যদের কথা বলো।

ইলেন স্যাটলার রেইম্যান, বলল জেমস, একটা ছবি ঠেলে দিল টেবিলের ওপাশে। বোটানিস্ট, অ্যালানের সাথে সম্পর্ক ছিল। বার্কলে ভার্সিটির এক পদার্থ বিজ্ঞানীকে বিয়ে করেছে, তাদের একটা ছেলে এবং মেয়ে আছে। ভার্সিটিতে মাঝে মাঝে লেকচার দেয়। বেশির ভাগ সময় বাড়িতে কাটায়। কারণ–

বলে যাও। বলে যাও।

অন্যদের বেশির ভাগই মৃত। আইনজীবী ডোনাল্ড জেনারো একটি বিজনেস ট্রিপে গিয়ে ডিসেন্ট্রি হয়ে মারা গেছে। কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডেনিশ নেডরিও মৃত। জন হ্যামন্ড যিনি ইন্টারন্যাশনাল জেনেটিক টেকনোলজিস কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, কোস্টারিকায় কোম্পানীর অবস্থা দেখতে গিয়ে তিনিও মারা গেছেন। ঐ সময় হ্যামন্ডের সঙ্গে তাঁর নাতি নাতনীরাও ছিল; বাচ্চাগুলো এখন তাদের মার সাথে আছে এবং–

কেউ ওদের সাথে যোগাযোগ করেছে? ইনজেন থেকে কেউ?

না কেউ করেনি। ছেলেটা কলেজে উঠেছে, মেয়েটা এখনো স্কুলছাত্রী। আর হ্যামন্ডের মৃত্যুর পর ইনজেন নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে বেশিরভাগ সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে।

এই প্রথম ব্যাসেলটন কথা বললেন, সাইট বি-ও কি বিক্রি হয়ে গেছে?

হতবুদ্ধি দেখাল জেমসকে। সাইট বি?

হ্যাঁ সাইট বি নিয়ে তোমার সাথে কেউ কথা বলেনি?

না নামটাও শুনলাম এই প্রথম। কি এটা?

সাইট বি সম্পর্কে কোনো কথা কানে এলে আমাদেরকে জানিয়ো, বললেন ব্যাসেলটন।

কাগজ আর ছবির তাড়াটা অধৈর্য ভঙ্গিতে টেবিলের একপাশে ঠেলে দিল ডজসন। তাকাল এডের দিকে। আর কি খবর এনেছো?

এই-ইসব ডঃ ডজসন।

এই-ই সব? বললেন ডজসন। ম্যালকমের কি খবর আর লেভিন? ওদের মধ্যে এখনো বন্ধুত্ব আছে?

কাগজপত্রে দ্রুত চোখ বোলাল জেমস। আমি ঠিক নিশ্চিত নই।

ভ্রু কোঁচকালেন ব্যাসেলটন। নিশ্চিত নও মানে?

ম্যালকমের সাথে লেভিনকে বেশ কিছুদিন আগে সান্তাফে ইন্সটিটিউটে দেখা গিয়েছিল। তবে সম্প্রতি ম্যালকম সান্তাফে-তে যায়নি। বার্কলের বায়োলজি ডিপার্টমেন্টে ভিজিটিং লেকচারশিপ নিয়ে সে এখন ব্যস্ত। বিবর্তনবাদের ম্যাথমেটিকাল মডেল পড়াচ্ছে সে ওখানে। মনে হয় লেভিনের সাথে এখন কোনো যোগাযোগ নেই তার। তবে লেভিনের কি একটা অভিযানের ব্যাপারে দু'জনের মাঝে একবার বেশ তর্কও হয়েছিল।

সামনে ঝুঁকে এল ডজসন। কি ধরনের অভিযান?

লেভিন এক বছর সময় হাতে নিয়ে অভিযানে বেরুনোর পরিকল্পনা করেছে। মোবাইল ফিল্ড সিস্টেমস নামের একটা কোম্পানীকে সে বিশেষ কিছু গাড়ি তৈরির নির্দেশ দিয়েছে। উডসাইডে কোম্পানীটা, মালিকের নাম জ্যাক থর্ন। বিজ্ঞানীদের ফিল্ড রিসার্চের জন্য থর্ন জিপ এবং ট্রাক তৈরি করে দেয়। আফ্রিকা, সিচুয়ান এবং চিলির সব বিজ্ঞানী বিশেষ ধরনের গাড়ির জন্য তার কাছেই ধর্না দেয়।

ম্যালকম জানে এই অভিযান সম্পর্কে?

অবশ্যই। মাঝে মাঝে থর্নের অফিসে তাকে দেখা গেছে। আর লেভিন তো প্রায়ই যেত। আর ওখানে ঢুঁ মারতে গিয়েই তো ওকে গারদে ঢুকতে হয়েছিল।

জেলে গিয়েছিল লেভিন? জিজ্ঞেস করলেন ব্যাসেলটন।

জ্বী। কাগজে চোখ রেখে জবাব দিল জেমস।

এইতো লেখা আছে, ফেব্রুয়ারীর দশ তারিখে পনের মাইল স্পীডের রাস্তায় একশ কুড়ি মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল-লেভিন। উডসাইড জুনিয়র স্কুলের ঠিক সামনে দিয়ে। বিচারক তার ফেরারী গাড়িটা বাজেয়াপ্ত করেন। বাতিল করেন লাইসেন্স এবং শাস্তি হিসেবে কমুনিটি সার্ভিসের দায়িত্ব দিয়ে দেন। তাকে স্কুলে ক্লাস নেয়ার আদেশ দেন তিনি।

হাসলেন ব্যাসেলটন। রিচার্ড লেভিন জুনিয়র স্কুলে মাষ্টারী করছে। দেখার মত দৃশ্য বটে।

কাজটা সে দায়িত্ববোধ থেকে করেছে। উডসাইডে সে নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছিল, থর্নের সাথেও যোগাযোগ ছিল আগের মত। তারপর দিন দুই আগে সে কোস্টারিকা যায়। আজ সকালেই তার ফেরার কথা।

কোথায় সে এখন?

জানিনা আমি। তবে ওকে খুঁজে পাওয়া বোধহয় কঠিন হবে।

কেন?

ইতস্ততঃ করল জেমস, তারপর গলা খাঁকারী দিয়ে বলল, যে প্লেনে কোস্টারিকা থেকে তার ফেরার কথা, আমার কন্ট্যাক্ট জানিয়েছে সে প্লেনে লেভিন ফেরেনি। অন্য কোনো প্লেনেও সে চড়েনি। ইয়ে মানে, হঠাৎ করেই যেন ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে রিচার্ড লেভিন।

নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। ব্যাসেলটনের দিকে তাকাল ডজসন। এদিক ওদিক মাথা নাড়ছেন তিনি। ডজসন কাগজপত্রগুলো যত্নের সাথে ভাঁজ করল, ঢোকাল ম্যানিলা খামে, জেমসের হাতে তুলে দিল।

নাউ লিসন ইউ স্টুপিড সন অফ দা বীচ, হিসহিস করে বলল ডজসন। আমি তোমার

কাছ থেকে এখন একটা জিনিসই চাই– যেখান থেকে পারো রিচার্ড লেভিনকে খুঁজে বের করো।

পাঁচ

নিজের অগোছালো অফিস ঘরে বসে কাজ করছিল আয়ান ম্যালকম, এমন সময় তার অ্যাসিস্ট্যান্ট বেভারলি এসে ঢুকল ঘরে। তার পেছন পেছন এল ডিএইচএল-এর এক লোক, হাতে ছোট একটা বাক্স।

বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত ডঃ ম্যালকম, বলল বেভারলি। কয়েকটা কাগজে আপনাকে সাইন করতে হবে ... কোস্টারিকা থেকে একটা স্যাম্পল এসেছে।

উঠে দাঁড়াল ম্যালকম, ছড়ি ছাড়াই ডেস্ক ঘুরে এল। ইদানিং ছড়ি ছাড়াই হাঁটাচলা করতে পারছে সে। মাঝে মাঝে পায়ের পুরানো ব্যথাটা চাগিয়ে ওঠে বটে, তবে তেমন আমল দেয় না ও।

ডেলিভারী ম্যানের কাছ থেকে ক্লিপবোর্ড নিয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করে দিল। কুরিয়ারের লোকটা চলে গেলে বাক্সটা খুলতে শুরু করল ম্যালকম।

বাক্সটা খুলতেই ম্যালকমের মুঠোর সমান একটা স্টেইনলেস স্টিলের সিলিন্ডার বেরিয়ে পড়ল। সিলিন্ডারের সাথে ছোট্ট একটা ক্যানিস্টার ধাতব একটা ভালভসহ। ভরা হিমায়িত গ্যাস।

ম্যালকম সিলিন্ডারের ওপর বাতিটা টেনে নিয়ে বলল, দেখিতো মজার কোনো জিনিস পাওয়া যায় কিনা। সিল ভেঙে সে সীসা খুলে ফেলল, হিসস করে সাদা গ্যাস বেরিয়ে সিলিন্ডারের ওপরে জমে গেল।

উঁকি মেরে ম্যালকম দেখল ভেতরে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ আর একটুকরো কাগজ। সিলিন্ডারটা উপুড় করল ম্যালকম। ভেতরের জিনিসগুলো ফেলল টেবিলের ওপর। ব্যাগে বিবর্ণ এক টুকরো সবুজ রঙের মাংস, ইঞ্চি দুয়েক হবে চওড়ায়। আলোতে টুকরোটা তুলে ধরল ম্যালকম, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর আবার টেবিলে নামিয়ে রাখল। সবুজ চামড়াটার দিকে তাকিয়ে ভাবনার অতলে তলিয়ে গেল সে।

হয়তো যা ভাবছি তাই হতে পারে, ভাবছে সে। হয়তো .....,

বেভারলি, হঠাৎ ডাকল ম্যালকম। চিড়িয়াখানার এলিজাবেথ গেভিম্যানকে ফোন করো। বলো আমি তাকে একটা জিনিস দেখাব। আর ব্যাপারটা গোপনীয় তাও জানাতে ভুলো না।

বেভারলি মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ম্যালকম স্যাম্পলের সাথে লাগানো কাগজের টুকরোটা খসিয়ে নিল। হলুদ রঙের কাগজ। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ঃ

আমিই ঠিক। আর আপনি ভুল করেছেন।

ভ্রু কোঁচকাল ম্যালকম। আবার সেই নাছোড়বান্দা হারামজাদাটা, ভাবল সে। তারপর ইন্টারকমে বলল, 'বেভারলি, এলিজাবেথকে ফোন করার পর রিচার্ড লেভিনের অফিসে একবার ধরো তো। ওর সাথে আমার এক্ষুণি কথা বলা দরকার।

পাহাড় চূড়োর গরম পাথরের ছ্যাঁকা খেল রিচার্ড লেভিন মুখে। মুখ হাঁ করে বাতাস টানল সে। পঞ্চাশ ফুট নিচে সাগর ফুঁসছে, কালো পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে প্রচণ্ড ঢেউ, ছিটকে উঠছে সাদা ফেনা। যে নৌকাটা লেভিনকে নিয়ে এসেছিল সেটা পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করেছে আবার, দিগন্ত রেখায় সাদা ফুটকির মত লাগছে। জনমানবহীন পাষাণ এই দ্বীপের কোথাও নোঙর করার মত নিরাপদ জেটি নেই বলে ঢেউ ঠেলে নৌকাটাকে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে।

গভীর দম নিয়ে ডিয়েগোর দিকে তাকাল রিচার্ড লেভিন। হাত বিশেক নিচে আরেকটা চূড়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে। ডিয়েগোর পিঠে মালপত্র বোঝাই র‍্যাকপ্যাক। কিন্তু ওজনটা সম্পর্কে ছেলেটা যেন সচেতন নয়। হাসিখুসি দেখাচ্ছে তাকে। এক মুখ হাসি ছড়িয়ে ওপর দিকে মাথা তুলল ডিয়েগো ভয় নেই, সিনর। আর বেশি দূরে নেই।

আমারও তাই ধারনা, বলল লেভিন। নৌকা থেকে দ্বীপটাকে দেখার সময় মনে হয়েছিল পাহাড় বেয়ে উঠতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু পাহাড়টা প্রায় খাড়া, লাভা জমে সৃষ্টি হওয়া পাথরগুলো ভঙ্গুর, পায়ের চাপে প্রায়ই গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে বলে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ওদের আরোহণ পর্ব। মাথার ওপর হাত তুলল লেভিন, আঙুলগুলো খাড়াভাবে ছড়ালো, খামচে ধরল পাথরের আরেকটা অবলম্বন। পাহাড়ের সাথে প্রায় ঝুলে থাকল লেভিন, ছোট নুড়িগুলো আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল, হাত ফস্কে গেল ওর। সাথে সাথে পাথরটাকে আবার ধরে ফেলল লেভিন, শরীরটাকে টেনে তুলল ওপর দিকে। ভয় আর পরিশ্রমে ঘন ঘন হাঁপাতে লাগল।

আর মাত্র বিশ মিটার, সেনর; সাহস যোগাল ডিয়েগো। আপনি পারবেন যেতে।

অবশ্যই পারব, বিড়বিড় করল লেভিন। চূড়োর একেবারে মাথায় পৌঁছে গেছে সে। এখানে বাতাসের তীব্রতা প্রচণ্ড, শিস কেটে যাচ্ছে কানের পাশ দিয়ে, ফুলে উঠছে পরনের কাপড়। যেন পাহাড়ের গা থেকে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। ওপরে মুখ তুলে চাইল লেভিন। চূড়োর ঠিক ডান ধার থেকে শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গলের রেখা।

প্রাণপণ চেষ্টায় শরীরটাকে টেনে তুলল লেভিন পাহাড় চূড়োর মাথায়, তারপর নরম, ভেজা পাথরের ওপর নিস্তেজ হয়ে শুয়ে থাকল। খানিক পর হাঁপাতে হাঁপাতে পেছন ফিরে চাইল সে। চলে এসেছে ডিয়েগো, উবু হয়ে বসেছে শ্যাওলা পড়া ঘাসে, লেভিনের দিকে তাকিয়ে হাসল। মুখ ঘোরাল লেভিন, অভিভূত হয়ে দেখল মাথার ওপরে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে বিশাল গাছের সারি। ওর পা দুটো জ্বালা করছে।

তাতে কিছু যায় আসে না– কারণ এখানে সে আসতে পেরেছে অবশেষে।

চারপাশের জঙ্গলে নজর বোলাতে লাগল লেভিন। এই মহারণ্যে মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেনি, দেখলেই বোঝা যায়। স্যাটেলাইটে ঠিক যেমনটি দেখা দিয়েছিল, তেমনটি! লেভিনকে বাধ্য হয়ে স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কারণ এ ধরনের ব্যক্তি মালিকানাধীন দ্বীপের ম্যাপ জোগাড় করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। এই দ্বীপটা যেন হারানোর পৃথিবীর মত। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ।

কান পেতে বাতাসের গর্জন শুনল লেভিন, বাতাসের ধাক্কায় তালগাছের পাতা থেকে ছিটকে আসা পানি ভিজিয়ে দিল মুখ। তারপর আরেকটা শব্দ শুনল সে, দূরাগত! যেন আর্তনাদ করছে কোন পাখি। কিন্তু শব্দটা অনেক গভীর এবং তীক্ষ্ণ। কান খাড়া করতে আবারও ডাকটা শুনল সে।

হঠাৎ 'ফস' করে একটা শব্দ হলো পেছনে। দেশলাই কাঠি জ্বালিয়েছে ডিয়েগো, সিগারেট ধরাবে। চট করে উঠে বসল লেভিন, থাবা মেরে ডিয়েগোর হাত থেকে জ্বলন্ত কাঠিটাকে ফেলে দিল মাটিতে। মাথা নেড়ে বলল, না।

ভ্রু কুঁচকে গেল ডিয়েগোর, বিস্মিত। লেভিন আঙুল রাখলো ঠোঁটে। পাখির ডাক যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে হাত তুলে দেখাল সে। শ্রাগ করল ডিয়েগো। চেহারা ভাবলেশশূন্য। সতর্ক হবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করল না সে।

এর কারণ ডিয়েগোর জানা নেই কাজটা আসলে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, গাঢ় সবুজ রঙের ব্যাকপ্যাকের চেইন খুলতে খুলতে ভাবল লেভিন। ব্যাগ খুলে লিন্ডস্ট্রাডট রাইফেলটা বের করল। সুইডেনে, বিশেষভাবে তার জন্যই তৈরি হয়েছে এটা এ্যানিমাল কন্ট্রোল টেকনোলজির সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায়। স্টকে ব্যারেল পেঁচিয়ে লাগাল, ফ্লুগার ক্লিপের সাথে আটকাল তারপর গ্যাসচার্জ চেক করে অস্ত্রটা দিল ডিয়েগোর হাতে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাইফেলটা নিল সে।

হোলস্টার থেকে কালো লিন্ডস্ট্রাডট পিস্তলটা খুলে কোমরে গুঁজল রিচার্ড লেভিন। তারপর পিস্তলটা আবার হাতে নিয়ে বার দুই সেফটি চেক করল, রেখে দিল হোলস্টারে। উঠে দাঁড়ালে লেভিন, ডিয়েগোকে ইঙ্গিত করল তাকে অনুসরণ করতে। ব্যাকপ্যাকের চেইন এঁটে আবার কাঁধে ঝোলাল ডিয়েগো।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল দু'জন চূড়োটাকে ক্রমশ পেছনে ফেলে রেখে। গাছের পাতার জলে ভিজে ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে প্রায় গোসল করে ফেলল। আশপাশে গহিন অরণ্য ছাড়া অন্য কিছু নজরে আসছে না। ফার্নের পাতাগুলো বিরাট, লম্বা চওড়া মানুষের মত। গাছগুলো বিশ ফুট লম্বা, শক্ত এবং সরু কাঁটাঅলা। ফার্ন গাছের মাথা ছাড়িয়ে আরো বড় বড় সব গাছ, ভেতরে সূর্যের আলো ঢুকতে দিচ্ছেনা। স্যাঁতসেঁতে স্পঞ্জের মত মাটির ওপর দিয়ে অন্ধকার জঙ্গলে কোন মতে পথ চলতে লাগল নীরব দুই অভিযাত্রী।

হাত ঘড়ির সাথে লাগানো কম্পাস দেখার জন্য মাঝে মাঝেই থেমে দাঁড়াতে হলো লেভিনকে। খাড়া একটা ঢাল বেয়ে পশ্চিম দিকে, দ্বীপের কেন্দ্র স্থলে এগিয়ে চলছে ওরা। লেভিন জানে দ্বীপটা পুরোনো একটি অগ্নিগিরির জ্বালামুখের অংশবিশেষ। শতাব্দীর হাওয়া বাতাস ওটাকে ক্ষয় করে চলেছে। দ্বীপের কেন্দ্রে রয়েছে কতগুলো পাহাড় চূড়ো, মিশেছে জ্বালামুখের সঙ্গে। তবে পূবের এই দিকটা, ল্যাণ্ডস্কেপ ঢালু কর্কশ এবং বিপজ্জনক।

ঢালের নিচে একটা বিলের মত নদীর পাশ দিয়ে যাবার সময় উত্তেজনায় বুক ঢিবঢিব করতে লাগল লেভিনের। নদী পার হয়ে আবার ঢাল বাইতে শুরু করল ওরা। পরের চূড়োটার মাথায় জঙ্গল ফিকে হয়ে আছে, ফুরফুরে বাতাস লাগল গায়ে। দ্বীপের দূরপ্রান্তে কালো পাহাড়ের সারি দেখতে পেল লেভিন, মাইল কয়েক দূরে। পাহাড় আর দ্বীপের মাঝখানে ঢেউ খেলানো অরণ্য ছাড়া কিছু নেই।

লেভিনের পাশে দাঁড়ানো ডিয়েগো মন্তব্য করল, অসাধারণ!

লেভিন ওর দিকে তাকিয়ে চোখ পাকাল। শব্দ করতে নিষেধ করছে।

কিন্তু সিনর, প্রতিবাদ করল সে। এখানে তো আর কেউ নেই।

বিরক্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল লেভিন। লোকটা বড় বেশি বকবক করে। নৌকায় আসার সময় সারাটা পথ এভাবে জ্বালিয়ে এসেছে। এখন দ্বীপে যখন পৌঁছা গেছে তখন কথা বলা, সিগারেট খাওয়া, গায়ে সুগন্ধি ছড়ানো সব কিছু বন্ধ। খাবার দাবার সব প্লাস্টিক ব্যাগে শক্ত করে বন্ধ করা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সব কাজ করা হয়েছে। কোন রকম শব্দ করা নিষেধ। ডিয়েগোকে সে বারবার এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অপাত্রে ঘি ঢালা হয়েছে। ব্যাপারটা মাথায় ঢোকেইনি ডিয়েগোর। লেভিন রাগের সাথে গুঁতো দিল ডিয়েগোকে, আবার মাথা নাড়ল এদিক ওদিক।

হাসল ডিয়েগো, সিনর, প্লীজ। এখানে শুধু পাখিই আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গভীর মেঘ গর্জনের মত গুরুগুরু একটা অস্বাভাবিক চিৎকার ভেসে এল নিচের জঙ্গল থেকে। এক সেকেন্ড পরে, বনভূমির আরেক ধার থেকে ভেসে এল প্রতিচিৎকার।

বিস্ফোরিত হয়ে উঠল ডিয়েগোর চোখ।

মুখ ভেংচালো লেভিন ঃ পাখি?

কথা বলল না ডিয়েগো, ঠোঁট কামড়ে ধরে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকল বনের দিকে।

দক্ষিণে, ওরা দেখল, জঙ্গলটা হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল, যেন বাতাসের ধাক্কায় বিস্ফোরণ ঘটেছে ওখানে। কিন্তু জঙ্গলের বাকি অংশ নিথর, নিরব। না, ওটা শুধু বাতাস হতে পারে না।

ডিয়েগো দ্রুত ক্রশ আঁকল বুকে।

ওদের কানে আবার ভেসে এল সেই চিৎকার, প্রায় এক মিনিট ধরে শব্দটা বাজল। তারপর আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল চারপাশ।

লেভিন চূড়ো বেয়ে নামতে শুরু করল, যাত্রা শুরু করল জঙ্গলের ঢালের দিকে, দ্বীপের আরো ভেতরে।

দ্রুত এগোচ্ছে লেভিন। মাটিতে চোখ, সাপটাপ আছে কি না দেখছে। হঠাৎ পেছনে মৃদু শিসের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল সে। ডিয়েগো। বাঁদিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে।

লতা-পাতা, ঝোপঝাড় ঠেলে ডিয়েগোর পেছন পেছন যেতে শুরু করল লেভিন। খানিক পরে লম্বা ঘাস আর ফার্নের ঢাকা দুটো সমান্তরাল ট্র্যাকের কাছে এসে পৌঁছল ওরা। তারপরও স্পষ্ট বোঝা গেল এটা একটা পুরানো ট্রেইল। এক সময় জিপ গাড়ি চলতো। রাস্তাটা সোজা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। লেভিন ডিয়েগোকে ইশারা করল। ব্যাকপ্যাকটা কাঁধ থেকে নামাল ডিয়েগো। এবার লেভিনের পালা। ব্যাগটা পিঠে চাপিয়ে ট্রেইল ধরে এগোতে শুরু করল লেভিন। পেছনে ডিয়েগো। মাঝে মাঝে জিপের ট্রাকটা চেনা কঠিন হয়ে উঠল, জঙ্গল কোথাও কোথাও খুব ঘন হবার কারণে। বোঝাই যায় বহুদিন এ রাস্তা কেউ

ব্যবহার করেনি। কাজেই বুনো লতাপাতার যথেচ্ছভাবে বেড়ে উঠতেও সমস্যা হয়নি।

লেভিনের পেছনে ডিয়েগো হঠাৎ ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল, চাপা গলায় কাকে যেন গালি দিল। ঘুরল লেভিন, দেখল নিঃশব্দে পা তুলছে ডিয়েগো রাস্তায় পড়ে থাকা পশুর সবুজ মলের গাদা থেকে। লেভিন আবার হাঁটা শুরু করল।

ডিয়েগো একটা ফার্নের পাতা দিয়ে জুতো পরিষ্কার করল। জিনিসটার রঙ সবুজ. শুকনো। তবে কোন গন্ধ নেই।

লেভিন মাটিতে সতর্ক চোখ রেখে এগোচ্ছিল, এই সময় আসল জিনিসটা দেখতে পেল। এখানে প্রাণীটা আগে মল ত্যাগ করেছে, বারো ইঞ্চির মত জায়গা জুড়ে। নিশ্চই জন্তুটা তৃণভোজী হবে। মল দেখে তাই ধারণা করল লেভিন। এবং আকারে বিরাট।

চুপ করে থাকল ডিয়েগো, ভয়ে ওর চোখ বড় হয়ে গেছে।

আবার যাত্রা শুরু করল লেভিন। রাস্তায় আরো প্রচুর মল চোখে পড়ল তার, তবে এবার আর তেমন উদ্বিগ্ন মনে হলো না ওকে। শুধু বারবার পিস্তলের বাটে হাত ছোঁয়াল সে, যেন নিরাপত্তা খুঁজছে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা নদীর ধারে চলে এল, দু'পাশেই কাদা মাখা তীর। এখানে এসে থেমে দাঁড়াল লেভিন। মাটিতে তিন আঙ্গুলে প্রাণীর পায়ের ছাপ, কোন কোনটি বেশ বড়। ওর হাতের তালুর মতই।

মুখ তুলে চাইতে লেভিন দেখল ডিয়েগো আবার বুকে ক্রুশ আঁকতে শুরু করেছে। এক হাত রাইফেলে।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, ঢেউর কুলকুল শব্দ শুনছে। হঠাৎ চোখে ঝিকিয়ে উঠল কি যেন। ঝুঁকল লেভিন, জিনিসটা তুলে নিল মাটি থেকে। পেন্সিল আকৃতির একটা কাঁচের টিউব এক পাশ ভাঙ্গা। আরেক পাশে মার্কিং দেয়া। দেখেই চিনতে পারল লেভিন। এটা এক ধরনের সরু কাঁচের নল, বিশ্বের সব ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করা হয়। লেভিন আলোতে নলটাকে তুলে ধরলো, ঘোরাতে লাগল আঙ্গুলের ফাঁকে। ব্যাপারটা অদ্ভুত ভাবল সে, এ ধরনের নল–

ঘুরে দাঁড়াল লেভিন, তক্ষুণি চোখের কোনে বিদ্যুৎ ঝলকের মত ছোট, বাদামী রঙের একটা প্রাণীকে ক্ষণিকের জন্য দেখতে পেল সে। নদী তীরে, মাটির ওপর দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। ইঁদুরের সমান কি যেন একটা।

সামনে বাড়ল লেভিন, হামাগুড়ি দিয়ে তীর ধরে এগোল। ছোট্ট প্রাণীটার পায়ের ছাপ ফুটে আছে কাদা মাটিতে। তিন আঙ্গুলে প্রাণীটা পাখির মত। আরো কিছু পায়ের ছাপ চোখে পড়ল ওর। কোন কোন, বেশ বড়, যত্রতত্র ছড়ানো।

এ ধরনের পায়ের ছাপ লেভিন এর আগেও দেখেছে, কলোরাডোর পুরগাটোয়ার নদীতে। ওখানে, প্রাচীন নদী তীর এখন ফসিলে পরিণত হয়েছে, ডায়নোসরের পায়ের ছাপ পাথরে আঁকা আছে। কিন্তু এই ছাপগুলো তাজা, জ্যান্ত কোন প্রাণীর সৃষ্টি।

নিতম্বে ভর দিয়ে বসল লেভিন, হঠাৎ ডান ধার থেকে পাখির কিচমিচ জাতীয় একটা মৃদু শব্দ ভেসে এল। ওদিকে তাকাতে দেখল লতাপাতাগুলো নড়ছে। পাথর হয়ে বসে থাকল লেভিন। দেখছে।

একটু পরে পাতার আড়াল থেকে ছোট্ট একটা প্রাণী উঁকি দিল। সাইজে ইঁদুরের চেয়ে বড় হবে না; লোমহীন চকচকে ত্বক, ছোট্ট মুখটার ওপরে বড় বড় একজোড়া চোখ। প্রাণীটার গায়ের রঙ সবুজ-বাদামী, লেভিনের দিকে চেয়ে ঘনঘন বিরক্তিকর কিচমিচ শব্দ করতে লাগল। যেন ওকে তাড়িয়ে দিতে চায়। স্থির হয়ে থাকল লেভিন, শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে যেন।

প্রাণীটাকে চিনতে পেরেছে সে। এটা একটা মুসারাস ট্রায়াসিক যুগের শেষের দিকের খুদে প্রসারোপড। এগুলোর কঙ্কাল পাওয়া গেছে শুধু দক্ষিণ আমেরিকায়। সবচেয়ে খুদে ডাইনোসরদের একটা প্রজাতি এটা।

এই দ্বীপে এ রকম একটা প্রাণী দেখতে পারে বলে আন্দাজ ছিল রিচার্ড লেভিনের। কিন্তু সামনা সামনি জ্যান্ত ডাইনোসর দেখে এখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। বিশেষ করে এত ছোট সাইজ দেখে। চোখ সরাতে পারছে না লেভিন খুদে প্রাণীটার ওপর থেকে। তাহলে এতদিনের পরিশ্রম সত্যি সফল হলো!

পাতার আড়াল থেকে ছোট্ট ডাইনোসরটা বেরিয়ে আসার সাহস দেখাল। যতটা লম্বা ভেবেছিল লেভিন ততটা নয় এটা। খুব বেশি হলে দশ সেন্টিমিটার হবে, তবে লেজটা অস্বাভাবিক মোটা। প্রায় টিকটিকির মত লাগছে দেখতে। দম নেবার সময় প্রাণীটার বুকের পাঁজর নড়তে দেখল লেভিন। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসেছে ওটা। খুদে হাতদুটো শূন্যে নাড়াল লেভিনকে উদ্দেশ্য করে, মুখ দিয়ে অবিরাম কিচকিচ শব্দ বেরিয়ে আসছে।

আস্তে, খুবই সাবধানে, লেভিন তার একটা হাত বাড়াল সামনের দিকে।

আবার কিচকিচ করে উঠল ডাইনোসর। তবে দৌড়ে পালাল না। লেভিনের হাতটাকে এগিয়ে আসতে দেখে মুরগীর বাচ্চার মত মাথাটাকে দু'দিকে নাড়াল শুধু।

ডাইনোসরটা একটা পাতার ওপর বসা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লেভিন আঙুল দিয়ে পাতার ডগা স্পর্শ করল। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে মুসারাস দাঁড়িয়ে গেল। ভারসাম্য রক্ষা করল ছড়ানো লেজ দিয়ে। ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়, দিব্যি হাল্কা পায়ে হেঁটে এল লেভিনের হাতে, তালুর ওপর এসে থামল। এত হাল্কা যে কোন ওজনই অনুভব করছে না লেভিন। হাঁটতে থাকল ডাইনোসার, শুঁকল লেভিনের আঙুল। মজা পেয়ে হাসল লেভিন।

হঠাৎ খুদে প্রাণীটা বিরক্তিসূচক 'হিসহিস' শব্দ করল, তারপর লাফিয়ে পড়ল লেভিনের হাত থেকে, অদৃশ্য হয়ে গেল পাতার আড়ালে। কিছু বুঝতে না পেরে চোখ পিটপিট করল রিচার্ড লেভিন। হঠাৎ ওর নাকে বিকট একটা গন্ধ এসে ধাক্কা মারল। বিপরীত দিকের ঝোপের আড়ালে শোনা গেল মরমর আওয়াজ।

সাথে সাথে লেভিনের মনে পড়ে গেল মাংসাশী ডাইনোসররা নদী তীরের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে, পানি খেতে আসা দুর্বল কাউকে দেখতে পেলে সাথে সাথে হামলা চালায়। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে অনেক। আকাশ ফাটানো আর্তনাদ শুনে ঘুরতেই লেভিন দেখল ডিয়েগো চিৎকার করছে, ঝোপের আড়ালে কিছু একটা ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ডিয়েগো আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল। ঝোপগুলো নড়তে লাগল প্রবলভাবে, লেভিন সেকেন্ডের জন্য বিরাট একটা পা দেখতে পেল, মাঝখানের আঙুলে ছোট বাঁকানো নখ। পরক্ষণে পা-টা চলে গেল ভেতরের দিকে। ঝোপগুলো ঝাঁকি খেতে লাগল আগের মতই।

এমন সময় জঙ্গল ফাঁক হয়ে গেল লেভিনের চোখের সামনে ভয়ঙ্কর চেহারার কতগুলো প্রাণী বেরিয়ে এল, ঘিরে ধরল ওকে। বিরাট একটা জন্তু ওকে তাড়া করল। বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরল লেভিন, নির্জলা আতঙ্কে দৌড় দিল পড়িমরি করে। টের পেল ভারী একটা থাবা ওর পিঠ থেকে ব্যাগটা ছিঁড়ে নিয়েছে। ধাক্কার চোটে হাঁটু ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল সে। লেভিন বুঝতে পারল তার সমস্ত পরিকল্পনা, অনুমান সবই মাঠে মারা গেছে, মারা যাচ্ছে সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

সাত

থর্ন মোবাইল ফিল্ড সিস্টেমস-এর কালো হরফে লেখা সাইনবোর্ডটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শেষপ্রান্তে বড় একটা ঘুরন্ত ধাতব দরজার মাথায় লাগানো। বাঁদিকে আরেকটা দরজা আছে, লোকজন আসা-যাওয়া করে এটা দিয়ে। জাফরি বসানো ছোট একটা বাক্সের ওপরে বাজারের সুইচ টিপে দিল আর্বি। ভেসে এল কর্কশ একটা কণ্ঠ, ভাগো, এখান থেকে।

আমরা, ডঃ থর্ন। আর্বি এবং কেলী।'

আচ্ছা, তাহলে এসো।

ক্লিক শব্দে খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকলো ওরা দুজন। কেলি কর্টিস এবং আর্বি। দু'জনেই উডসাইড জুনিয়র হাই স্কুলে পড়ে, ক্লাশ সেভেনে। কেলির বয়স তের, আর্বি ক্লাসের কনিষ্ঠতম সদস্য। মাত্র এগার বছর বয়স হলেও কম্পিউটারের জাদুকর বলে সবাই ওকে। দু'জনেরই খুব প্রিয় শিক্ষক রিচার্ড লেভিন। সে এই স্কুলে পার্টটাইম ক্লাস নিচ্ছে, বিষয় ডাইনোসার। কিন্তু কদিন ধরে লেভিন ক্লাসে আসছে না দেখে আর্বি এবং কেলি চিন্তায় পড়ে গেছে। তাই ডঃ জ্যাক থর্নের ফ্যাক্টরীতে এসেছে খোঁজ নিতে। ডঃ থর্নের সাথে ওদের বেশ ভাল পরিচয় আছে প্রতিবেশী হবার সুবাদে। আর ডঃ লেভিন ও থর্নের বন্ধু এবং খদ্দের।

আর্বি এবং কেলী খোলা, বড় একটি গুদাম ঘরে এসে হাজির হলো। শ্রমিকরা বিভিন্ন আকৃতির গাড়ির সাইজ বদলের কাজে ব্যস্ত; বাতাসে অ্যাসিটিলিন, ইঞ্জিন অয়েল এবং তাজা রংয়ের গন্ধ। ঠিক সামনে কেলী দেখল একটা ছাদকাটা ফোর্ড এক্সপ্লোরার, দু'জন সহকারী মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে কালো সোলার সেলের বড় চ্যাপ্টা একটা প্যানেল বসাচ্ছে ওটার মাথায়। এক্সপ্লোরার এর হুড খোলা, ভি-সিক্স এঞ্জিনটা তুলে আনা হয়েছে, শ্রমিকরা ঐ জায়গায় গোলাকার জুতার বাক্সের মতো নতুন এবং ছোট একটি ইঞ্জিন বসাচ্ছে।

ডানদিকে তাকাতে কেলী দেখতে পেল থর্নের অন্য লোকজন দুটো অদ্ভুত ট্রেলারকে নিয়ে ব্যস্ত। গত কয়েক হপ্তা ধরে এই কাজটাই ওদেরকে করতে দেখছে কেলী। তবে উইক এন্ডের সাধারণ ট্রেলারের মত নয় এগুলো। একটা তো খুবই বড় রং চকচকে, বাসের মতো, চারজন মানুষ দিব্যি ঘুমাতে পারবে ভেতরে, সেই সাথে ট্রেলারটা সব ধরনের সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্টে বোঝাই। নাম রাখা হয়েছে চ্যালেঞ্জার, পার্ক করলে আপনা থেকেই দেয়াল সরে যায়, ভেতরের জায়গা বেড়ে যায়।

আর দ্বিতীয় ট্রেলারটা প্রথমটার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট। প্রথমটা টেনে নিয়ে চলে দ্বিতীয়টাকে। দ্বিতীয় ট্রেলারে আছে প্রচুর ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট এবং কিছু অত্যন্ত জটিল

এবং দামী যন্ত্রপাতি, কেলির ঠিক জানা নেই এগুলো কি। এখন দ্বিতীয় ট্রেলারটাকে নিয়ে কাজ করছে শ্রমিকরা। ছাদে ওয়েল্ডিং চলছে। তীব্র, চোখ ধাঁধানো স্ফুলিঙ্গে যান্ত্রিক কাঠামোটা প্রায় ঢাকা পড়েছে। তবে দেখে মনে হচ্ছে কাজ প্রায় শেষ, সম্ভবত চেয়ার এবং সীটগুলো বসানো বাকি। ওগুলো ফেলে রাখা হয়েছে মাটিতে।

ডঃ জ্যাক থর্ন গুদাম ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেলারের ছাদে এক ওয়েল্ডারকে চিৎকার করে বলছিলেন, তাড়াতাড়ি করো। তাড়াতাড়ি করো। আজকের মধ্যে কাজ শেষ করতেই হবে।

ডঃ থর্ন পঞ্চাশ ছাড়িয়েছেন বছর পাঁচেক আগে, তার চুলের রঙ ধূসর-সাদা, বুক ব্যারেলের মত ফুলে আছে। চোখে তারের চশমা না থাকলে অবসরপ্রাপ্ত বিজয়ী ফাইটার হিসেবে দিব্যি তাঁকে চালানো যেত। এত শক্তিশালী তাঁর শারীরিক গঠন এবং মুভমেন্ট এত দ্রুত যে কেলীর মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় ইনি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান।

হেনরী নামে তাঁর এক সহকর্মীকে ডাকতে ডাকতে ডঃ থর্ন ফিরলেন কেলী এবং আর্বির দিকে। বললেন, দেখ, কাদের নিয়ে কাজ করছি আমি। সব অপদার্থের দল। একটা কাজও আমি না বলে দিলে ঠিকমত করতে পারে না।

এটা কি? ট্রেলারের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল আর্বি!

আই ইউ ডি, বললেন ডঃ থর্ন।

আই ইউ ডি?

ইন্টারন্যাল উরসাইন ভাটারেন্ট-লেভিনের দেয়া নাম। সাংঘাতিক সিকিওরড কার। তা লেভিন কোথায়?

জানি না ঠিক, বলল আর্বি।

মানে? আজ তোমাদের ক্লাস নেয়নি সে?

না। কয়েকদিন ধরেই তো আসছেন না।

ভ্রু কোঁচকালেন থর্ন। এহ্হে আজকে লেভিনকে খুব দরকার ছিল। ফিল্ড টেস্টিং এর আগে ফাইনাল রিভিশন দেব ভেবেছিলাম। আজ তো ওর ফিরে আসার কথা।

কোত্থেকে আসবেন? জিজ্ঞেস করল কেলী

একটা ফিল্ড ট্রিপে গেছে, বললেন ডঃ থর্ন যাবার সময় বেশ উত্তেজিত। দেখেছি ওকে।

কোথায় গেছে জানেন?

কিভাবে জানব? বললেন থর্ন। আমাকে সে বলেনি।আর আমি প্রশ্ন করাও বাদ দিয়ে দিয়েছি। জানোইতো বিজ্ঞানীর জাতটাই এরকম। সব সময় লুকোচুরি খেলার ভান। কিন্তু লেভিনের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওর ফিল্ড ভেহিকলগুলোর পেছনে দুজনে মিলে এত খাটাখাটি করলাম। এখন সব ঠিকঠাক। আর এখনই তার পাত্তা নেই। তোমরা ঠিক জানো তো ও আজ ক্লাসে যায়নি?

না যাননি উনি। বলল কেলী।

তাহলে নির্ঘাৎ কেটে পড়েছে। বললেন থর্ন। বেশ বেশ। তা এখন ফিল্ড টেস্টের কি হবে? গাড়ি টাড়ি নিয়ে বেরুবার কথা ছিল।

ডঃ লেভিনকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে, ডঃ থর্ন, বলল আর্বি। ওনাকে যতটা চিনি

উনি কাউকে কিছু না বলে এভাবে হুট করে অদৃশ্য হয়ে যাবার লোক নন। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ডঃ লেভিন বোধ হয় কোন বিপদে পড়েছেন।

তাই নাকি? তোমার এরকম মনে হবার কারণ? জানতে চাইলেন ডঃ থর্ন।

কারণ ঠিক জানি না। তবে কোন কারণ ছাড়াই তিনি আত্মগোপন করে থাকবেন বলেও আমার মনে হয় না। বলল আর্বি।

হুম্ বলে চুপ হয়ে গেলেন ডঃ থর্ন। কিছুক্ষণ পরে আর্বি বলল, একটা কাজ করলে হয় না?

কি কাজ? জানতে চাইলেন থর্ন।

আপনার স্যাটেলাইট ফোন থাকলে তা দিয়ে ডঃ লেভিনের সাথে যোগাযোগ করছেন না কেন? ওনার কাছে একটা স্যাটেলাইট ফোন সব সময় থাকে বলেই জানি।

মন্দ বলনি, বললেন ডঃ থর্ন। চলো, অফিসে গিয়ে বসি।

থর্নের ছোট্ট অফিস ঘরটা গুদাম ঘরের এক কোণে। ভেতরটা ডেকোরেশন করা হয়েছে নীল রঙ দিয়ে। নানা ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র, ইকুইপমেন্ট ক্যাটালগ, ফ্যাক্সের কাগজপত্রে বোঝাই ডেস্ক। জঞ্জালগুলের ভেতর থেকে হাতড়ে ধূসর রঙের ছোট একটা ফোন তুলে নিলেন ডঃ থর্ন। এই যে পেয়েছি, আর্বিকে দেখালেন তিনি যন্ত্রটা। সুন্দর না? নিজেই ডিজাইন করেছি।

কেলী বলল, অবিকল সেলুলার ফোনের মত দেখতে।

হ্যাঁ। কিন্তু এটা সেলুলার নয়। সেলুলার ফোনে শুধু একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে কথা বলা যায়। কিন্তু স্যাটেলাইট ফোন মহাশূন্যে স্যাটেলাইটের সাথে সরাসরি সংযুক্ত। ফলে বিশ্বের যে কোন স্থানে যে কোন মানুষের সাথে আমি কথা বলতে পারি। দ্রুত ডায়াল করতে লাগলেন তিনি। একই সাথে বকবকানিও চলল। মনে হয় রিচার্ড ওর ফ্লাইট মিস করেছে। তবে ওর সাথে যোগাযোগ সম্ভব না হলে সারাহ্ হার্ডিং-এর সাথে কথা বলব আমি।

সারাহ্ হার্ডিং? মুখ তুলে জানতে চাইল আর্বি।

কে তিনি?

বিশ্বের একমাত্র নামকরা তরুণী অ্যানিমাল বিহেভারিস্ট, বললেন ডঃ থর্ন, মানে প্রাণীদের আচার আচরণ পরীক্ষা করে দেখে সে।

সারাহ্ হার্ডিং সম্পর্কে কেলী জানে অনেক কিছু। রীতিমত দেবতাজ্ঞানে পূজা করে সে সারাহ্ হার্ডিংকে। কেলী সারাহ্'র লেখা সমস্ত রচনা পড়েছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সারাহ্ ছিল সাধারণ মানের একজন ছাত্রী। কিন্তু এখন, এই তেত্রিশ বছর বয়সে প্রিন্সটনের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। সুন্দরী সারাহ্ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, নিজে যেটা ভাল বোঝে সেটা করে ছাড়ে। সরাসরি খোলা ময়দানে গবেষণার জন্য নেমে পড়েছে সারাহ্। আফ্রিকায় একা কাজ করছে সে এখন সিংহ এবং হায়েনাদের ওপর। ভয় কাকে বলে জানে না সারাহ্। একবার, তার ল্যান্ড রোভারটা পথের মাঝে অকেজো হয়ে যায়, সারাহ্ সাভান্না অঞ্চলের বিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছিল সিংহদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মেরে। হিংস্র শ্বাপদগুলো সাহসই পায়নি সারাহ্'র ওপর হামলা করার।

সারাহ্ হার্ডিং সব সময় শর্টস আর খাকি শার্ট পরে থাকে, কাঁধে ঝোলানো থাকে বিনোকিউলার। তার চুলগুলো ঘন কালো, খাটো শরীর সুগঠিত। চাউনিটা কঠিন হলেও নারীসুলভ কমনিয়তা সারাহ্র মধ্যে বিদ্যমান পুরোটাই। অন্ততঃ কেলীর কাছে সারাহ্র এই চেহারাই ফুটে উঠেছে ছবিতে এবং কল্পনায়।

ভদ্রমহিলার নাম শুনিনি আগে; বলল আর্বি।

থর্ন বললেন, শুনবে কি করে? সারাক্ষণই বোধহয় কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাক, নাকি?

কাঁধ কুঁচকে জবাব দিল আর্বি, না। নিজের সমালোচনা সহ্য করতে পারে না সে।

তো এই সারাহ্ হার্ডিং গত মাসেও বেশ কয়েকবার লেভিনের সাথে কথা বলেছে। এই ইকুইপমেন্ট নিয়ে সারাহ্ লেভিনকে সাহায্য করেছে। কথা বলতে বলতে স্যাটেলাইট ফোনের বোতাম টেপাটেপি করে চলছিলেন ডঃ থর্ন। ওটা বিপবিপ করে বেজেই চলছিল। কিন্তু কোন জবাব আসছে না। হঠাৎ ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, পর মুহূর্তে ভেসে এল একটা স্পষ্ট পুরুষ কণ্ঠ, লেভিন বলছি?

চমৎকার। পেয়েছি ওকে। বললেন ডঃ থর্ন। আরেকটা বোতাম টিপলেন তিনি হ্যান্ডসেটের।

রিচার্ড, ডঃ থর্ন বলছি।

একটা হিসহিসে আওয়াজ ভেসে এল স্পীকার ফোনে, তারপর কাশির শব্দ, এক সেকেন্ড পরে খসখসে একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

হ্যালো? হ্যালো? লেভিন বলছি।

ফোনের বোতাম টিপে দিলেন ডঃ থর্ন রিচার্ড, আমি থর্ন। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

হ্যালো? ওপাশ দিয়ে বলল রিচার্ড। হ্যালো? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন থর্নঃ 'রিচার্ড ট্রান্সমিটের জন্য'টি' লেখা বোতামটা টিপে দাও। ওভার।

'হ্যালো? আবার খকখক কাশির শব্দ, খরখরে গলা বলে উঠল, দিস ইজ লেভিন, হ্যালো?

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন ডঃ থর্ন। ও আসলে জানেই না ফোনটা কিভাবে কাজ করে। ধ্যাত্তেরি। ওকে পইপই করে বলেছিলাম ভাল করে শিখে নাও। কিন্তু কোন আগ্রহই ছিল না তার। জিনিয়াসেরা এমনই হয়। ভাবে তারা সবকিছু জানে। কিছু শেখার প্রয়োজন নেই তাদের। কিন্তু স্যাটেলাইট ফোন কোন খেলনা জিনিস নয়।

ডঃ থর্ন (SEND) লেখা বোতামে চাপ দিয়ে বললেন, রিচার্ড, আমার কথা শোনো। তোমাকে অবশ্যই টি লেখা বোতামে–

দিস ইজ লেভিন। হ্যালো? লেভিন বলছি, প্লিজ আমার সাহায্যের বড় প্রয়োজন। গোঙ্গানীর আওয়াজ। আমার কথা শুনতে পেলে দয়া করে সাহায্য নিয়ে আসুন। শুনুন আমি দ্বীপে আছি। অনেক কষ্টে এখানে আসতে পেরেছি, কিন্তু–

কোনকিছু ভেঙে যাবার শব্দ হল। তারপর হিসহিসে আওয়াজ।

আ হ্যা, বললেন থর্ন।

কি হলো? সামনের দিকে ঝুঁকে এল আর্বি।

আমরা ওকে হারিয়ে ফেলছি।

কেন?

ব্যাটারী, বললেন থর্ন দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ধ্যাত্তেরি। রিচার্ড কোথায় তুমি?

'----- মারা গেছে ইতিমধ্যে– অবস্থা খুব --- এখন-সাংঘাতিক খারাপ জানি না– যদি পারেন সাহায্য নিয়ে–

রিচার্ড। কোত্থেকে বলছ তুমি?

ফোনটা হিসহিসিয়ে উঠল, ট্রান্সমিশন দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছে। ওরা শুনল লেভিন বলছে. আমাকে ঘিরে আছে, এবং ভয়ংকর গন্ধ পাই আমি রাতে-

কিসের কথা বলছেন উনি?

'-- আহত আমি-- বেশিক্ষন পারব না। প্লিজ–

তারপর আরেকটা হিসহিস শব্দ।

তারপর আর কোন শব্দ নেই।

হ্যান্ড সেটের সুইচ অফ করলেন ডঃ থর্ন, ঘুরে দাঁড়ালেন বাচ্চাদের দিকে। ভয়ে ম্লান হয়ে গেছে ওদের চেহারা। ওকে আমাদের খুঁজে পেতে হবে, বললেন, তিনি, এবং এখনই।

আট

দিন দুয়েক পরের ঘটনা।

কেলী এবং আর্বি আবার এসেছে ডঃ থর্নের কারখানায়। অবাক হয়ে দেখল কারখানার বেশিরভাগ লোকজন নেই, গুদামঘর যান্ত্রিক আবর্জনা মুক্ত। শুধু দুটো ট্রেলার আর এক্সপ্লোরার, দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, গাঢ় সবুজ রঙ করা হয়েছে, অভিযানের জন্য প্রস্তুত।

কাজ শেষ। অবাক হয়ে বলল আর্বি।

তোমাদের সে কথা আগেই বলেছি আমি, বললেন ডঃ থর্ন। ঘুরে দাঁড়ালেন চিফ ফোরম্যান এডি কারের দিকে। এডির বয়স বিশের কোঠায়, গাট্টা গোট্টা চেহারা।

এডি আর কিছু বাকি আছে? জানতে চাইলেন তিনি।

শুধু শুকানো বাকি, ডক্টর, বলল এডি। কয়েকটা জায়গায় রং এখনো কাঁচা। কাল সকাল নাগাদ পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে।

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না আমরা, বললেন ডঃ থর্ন। এখনই আমাদের রওনা হতে হবে।

আমরা?

হ্যাঁ, গাড়িটা তোমাকেই চালাতে হবে, এডি। মাঝরাতের মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছানো চাই।'

কিন্তু আমি ভেবেছিলাম শুধু ফিল্ড টেস্টিং -

এখন আর সে সময় নেই। সোজা আমাদের গন্তব্যে গিয়ে হাজির হতে হবে। সামনের দরজার বাজারটা বেজে উঠল। সম্ভবত ম্যালকম এসেছে দরজা খোলার জন্য বোতাম টিপলেন ডঃ থর্ন।

ম্যালকমই। রিচার্ড লেভিনকে উদ্ধার পর্বে সেও অংশ নিতে চলেছে। লেভিন তাকে যে

প্যাকেটটা পাঠিয়েছিল সেটা ভালভাবে ম্যালকম পরীক্ষা করেছে। শিহরিত হয়ে আবিষ্কার করেছে মাংসের টুকরোটা কোন ডাইনোসরের শরীর থেকে কেটে পাঠিয়েছে লেভিন তাকে। আর লেভিন চিঠিতে জানিয়েছে প্রাণীটা মৃত্যুর আগে সম্ভবত স্বগোত্র কোন ডাইনোসরের সাথে মরণপন লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। লড়াইয়ে আঘাতজনিত কারণে হয়তো ডাইনোসরটার মৃত্যু হয়। লেভিন ডাইনোসরের পায়ে যে দগদগে ঘা দেখেছিল সেটা ছিল আসলে কামড়ের দাগ। এরকম দুর্দান্ত একটা তথ্য জানার পর আয়ান ম্যালকম বসে থাকে কি করে? ডঃ থর্নের কাছে লেভিনের নিখোঁজ সংবাদ শুনে সে নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে যেতে। তবে লেভিন কোথায় গিয়েছে সেটা কেউ জানত না। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে আর্বি। কম্পিউটারের যাদুকর সে। লেভিনের বাসায় গিয়ে প্রচুর খেটেখুঁটে কম্পিউটার ঘেঁটে অবশেষে আর্বি বের করতে সমর্থ হয়েছে রিচার্ড লেভিন সাইটবি বা ইসলা সোরনা নামের দ্বীপে গিয়েছে। আসল তথ্যটা জানার পরপরই ঐ দ্বীপে যাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে রহস্যময় একটি ঘটনা। কে বা কারা যেন আয়ান ম্যালকমের অফিস তছনছ করে দিয়ে গেছে। অনুপ্রবেশকারীরা হন্যে হয়ে কি যেন খুঁজছে। ম্যালকমের ধারণা, যারাই তার অফিসে আসুক, এসেছিল লেভিনের খোঁজ পেতে। কিন্তু কেন তারা লেভিনের খোঁজ পেতে চাইবে? জানে না আয়ান ম্যালকম।

ম্যালকম অফিসে ঢুকেই বলল, আমাদের হাতে সময় কিন্তু খুব কম। লেভিনকে নিয়ে খুবই চিন্তায় আছি।

আপনারা কি কোস্টারিকায় যাচ্ছেন? জানতে চাইল কেলী।

হ্যাঁ। লেভিনকে পেতেই হবে। কি জানি বেশি দেরি হয়ে গেল কি না। জবাব দিল ম্যালকম।

আমরাও আপনাদের সাথে যাব; বলল কেলী।

ঠিক, সুর মেলাল আর্বি। আমরাও যাব।

অসম্ভব, বললেন ডঃ থর্ন, তোমাদের যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু আমাদের যাবার অধিকার আছে।

ডঃ লেভিন আমাদের বাবামার সাথে এ নিয়ে আগে কথাও বলেছেন।

আমরা যাবার অনুমতিও পেয়েছি।

তোমরা অনুমতি পেয়েছ, কর্কশ গলায় বললেন থর্ন। এখান থেকে একশ মাইল দূরের জঙ্গলে ফিল্ড টেস্টে যেতে। কিন্তু আমরা সেখানে যাচ্ছি না। আমরা যেখানে যাচ্ছি খুবই বিপজ্জনক জায়গা সেটা। আর তোমরা আমাদের সাথে আসছ না, এটাই শেষ কথা।

কিন্তু -

শোনো ছেলেমেয়েরা, বললেন ডঃ থর্ন। আমার মেজাজ খারাপ করো না। আমাকে আফ্রিকায় একটা জরুরী ফোন করতে হবে। এখন বাড়ি যাও।

মুখ কালো করে ফিরে এল আর্বি আর কেলী।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আর্বি বলল, দেখেছ কি বেঈমান? আমি সাহায্য না করলে ওরা এত তাড়াতাড়ি ডঃ লেভিনের খোঁজ পেত?

কিচ্ছু করার নেই আর্বি, বলল কেলী। উনি নেবেন না আমাদেরকে।

ডঃ ম্যালকমকে বলে দেখব?

চলোতো দেখি।

কিন্তু ম্যালকমও ওদের হতাশ করল।

বিপজ্জনক অভিযান এটা, এতে বাচ্চাদের সাথে নেয়া মানে ঝুঁকি আরো বাড়ানো. ইত্যাদি নয়ছয় বুঝিয়ে সে ফিরিয়ে দিল কেলী এবং আর্বিকে। গোমড়া মুখে দু'জন চলে এল এক্সপ্লোরার-এর কাছে।

লেভিন উদ্ধার অভিযানে বিশালকায় এই গাড়িটা এখন ব্যবহার করা হবে। ওটার দিকে তাকিয়ে অভিযানের গন্ধ পেল দু'জনে। কিন্তু দুঃখ একটাই অভিযানটাতে তারা কেউ অংশ নিতে পারছে না।

আর্বি গুটি গুটি পায়ে এগোল এক্সপ্লোরার-এর দিকে। এটার ছাত এবং হুড মুড়ে দেয়া হয়েছে কালো ফটোভোলটেক প্যানেল দিয়ে, ভেতরে ঝকমকে সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি দ্যুতি ছড়াচ্ছে। বড় ট্রেলারটার জানালা দিয়ে উঁকি দিল আর্বি, বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ওয়াও, দেখ ভেতরে কি মাল আছে!

দেখছি, বলে কেলী খুলে ফেলল ভারী দরজা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ট্রেলারে।

ট্রেলারের অভ্যন্তর ভাগ পর্দা গালিচা ইত্যাদি দিয়ে সাজানো, ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট প্রচুর। আলাদা গবেষণার জন্য ট্রেলারটাকে দুটো সেকশনে ভাগ করা হয়েছে। মূল সেকশনটা হলো একটা বায়োলজিক্যাল ল্যাব, বিভিন্ন ট্রে, প্যান, ভিডিও মনিটরের সাথে সংযুক্ত মাইক্রোসকোপ দিয়ে সাজানো। এছাড়াও আছে বায়োকেমিস্ট্রি ইকুইপমেন্ট, স্পেকট্রোমিটার, স্যাম্পল অ্যানালাইজারের একটা সিরিজ। এসবের পাশের ঘরটা হলো কম্পিউটার সেকশন, বেশ বড়সড়। ল্যাবরেটরীর সমস্ত উপকরণই ছোট আকারের দেয়ালের সাথে লাগানো। ছোট ছোট টেবিলের ওপর রাখা জিনিসগুলো।

জায়গাটা ঠাণ্ডা, বলল আর্বি।

কোন মন্তব্য করল না কেলী। ল্যাবটাকে খুঁটিয়ে দেখছে সে। ডঃ লেভিন এই ট্রেলারের ডিজাইন করেছে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে। সাধারণ কোন গবেষনাগার নয় এটা। এখানে বড়সড় একটা বায়োলজি ইউনিট আর কম্পিউটার ইউনিট দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এগুলো কিসের জন্য?

দেয়ালে ছোট একটা বুক শেলফ নজর কাড়ল কেলীর। ওতে ডাইনোসরদের আচার-আচারণসহ বায়োলজির ওপর প্রচুর বই। শেলফের সামনে থেকে সরে গেল কেলী। ট্রেলারটা যেসব জায়গায় শক্ত করে তৈরি করা হয়েছে সেখানকার দেয়ালে কুচকুচে কালো রঙের মৌমাছির বাসার মত কতগুলা জিনিস ঝোলানো দেখল সে। থর্নকে বলতে শুনেছে কেলী এই একই জিনিস সুপার সনিক জেট ফাইটারে ব্যবহার করা হয়। খুব উজ্জ্বল এবং শক্ত জিনিসগুলো। কেলী লক্ষ করল জানালা ভেঙ্গে যেখানে বিশেষ ধরনের কাঁচ বসানো হয়েছে, ভেতরে মজবুত তারের জালসহ।

ট্রেলারটাকে এত শক্তভাবে তৈরি করার কারণটা কি?

ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে অস্বস্তিবোধ হল কেলীর। মনে পড়ল দিন দুই আগে স্যাটেলাইট ফোনে শোনা ডঃ লেভিনের কথা। তিনি বলছিলেন তাকে কারা যেন ঘিরে রেখেছে।

কিসে ঘিরে রেখেছে?

তিনি বলেছিলেন, ওদের শরীরের গন্ধ পাই আমি। বিশেষ করে রাতে।

কিসের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি?

ওরা কারা?

খঁচখচে মন নিয়ে ট্রেলারের পেছন দিকে চলে এল কেলী। ছোটখাট বাড়ি একটা। জানালায় রেশমি কাপড়ের পর্দা। সুসজ্জিত রান্নাঘর, টয়লেট, চারটে বিছানা। বিছানার ওপরে এবং নিচে স্টোরেজ কমপার্টমেন্ট। এমনকি শাওয়ারও আছে। এখান থেকে কেলী এগোল সামনের প্যাসেজের দিকে। ওদিকে আরেকটা ট্রেলার। ট্রেনের বগীর মত বড় ট্রেলারটার সাথে সংযুক্ত। দ্বিতীয় ট্রেলারটাকে দেখে স্টোর রুম মনে হল কেলীর। অতিরিক্ত টায়ার, স্পেয়ার পার্টস, বেশ কিছু ল্যাব ইকুইপমেন্ট, শেলফ, কেবিনেট ইত্যাদি। সবকিছুর অতিরিক্ত সরবরাহ দেখে মনে হয় খুব দূরে কোথাও যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। এমনকি ট্রেলারের পেছন দিকে একটা মোটর সাইকেলও আছে। কেলী দু'একটা কেবিনেট নিয়ে টানাটানি করল। কিন্তু তালা মারা সবগুলো। এ ট্রেলারটাও মজবুতভাবে তৈরি। আর এখানে টিভি মনিটরও আছে।

কেন? আবার মনে প্রশ্ন জাগল কেলীর। এত মজবুত করে বানানো হয়েছে কেন?

তবে বেশিক্ষণ ভাবার সুযোগ পেল না কেলী। তার আগেই ধরা পড়ে গেল ফোরম্যান এডির হাতে।

এখানে ঘুরঘুর করছ কেন? বলল সে গম্ভীর হয়ে। বাড়ি যাওনি যে?

যাচ্ছিতো। আর্বির সাথে চোখাচোখি করল কেলী। এক্ষুণি যাচ্ছি।

বিরস বদনে নেমে পড়ল দু'জনে ট্রেলার থেকে। হাঁটা দিল গেটের উদ্দেশ্যে।

নয়

এ্যানিমাল কোয়ার্টার্স লেখা দরজাটা দড়াম করে খুলে ফেলল লুইস ডজসন। সাথে সাথে ঘেউ ঘেউ করে উঠল সবগুলো কুকুর। দু'পাশে দশ ফুট উঁচু বেশ কতগুলো খাঁচার তার মাঝে চওড়া প্যাসেজ ধরে এগুলো ডজসন ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোতে অবস্থিত বায়োসিন কর্পোরেশনের এই বিল্ডিংটা আকারে বিশাল, এখানে বিভিন্ন প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা চলে।

কোম্পানীর প্রধান ব্যক্তি জেফ রসিটার লুইস ডজসনের পাশাপাশি হাঁটছেন, দামী ইটালিয়ান স্যুটের ল্যাপেলে হাত বুলিয়ে অন্ধকার মুখে তিনি বললেন, এই জায়গাটায় ঢুকলে আমার বমি আসে। তুমি কোন্ আক্কেলে এখানে ডেকে নিয়ে এলে আমাকে?

কারণ, বলল ডজসন, কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু জরুরী আলাপ আছে আপনার সাথে আমার। আর এখানেই সেটা নিরাপদে বলা যাবে।

বিল্ডিংয়ের কেন্দ্রস্থলে কাঁচমোড়া সুপারিনটেন্ডেন্টের ঘরে নিয়ে এল ডজসন জেফ রসিটারকে। ভেতরে ঢুকতেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ কমে এল। অবশ্য জানালা দিয়ে জানোয়ারগুলোকে এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

ব্যাপারটা জটিল কিছু নয়, পায়চারী শুরু করল ডজসন। তবে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

লুইস ডজসনের বয়স পঁয়তাল্লিশ, মসৃণ, ভদ্রলোকের চেহারা। চেহারায় বাচ্চা বাচ্চা ভাব আছে, আচরণ অমায়িক হলেও ডজসন আসলে বিপজ্জনক একজন মানুষ। বলা হয় তার জেনারেশনের সবচেয়ে নির্দয় এবং হিংস্র স্বভাবের ব্যক্তি হলো লুইস ডজসন। তার ক্যারিয়ার নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে, হপকিন্সে গ্রাজুয়েশন করার সময় এফডিএ-র অনুমতি ছাড়া মানব কোষ থেরাপী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হয় ডজসন। পরে, বায়োসিনে যোগ দিয়ে সে চিলিতে একটি র‍্যাবিস ভ্যাকসিন টেস্ট চালাতে গিয়ে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করে। চিলির অশিক্ষিত কৃষকদেরকে কখনো জানতে দেয়নি তাদের নিয়ে কি ধরনের গবেষণা করছে সে।

প্রতিটি ক্ষেত্রে ডজসন নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছে বিজ্ঞানী হিসেবে, কিন্তু অন্যদের বাধার সম্মুখীন হয়ে কাজগুলো শেষ করতে পারেনি। অবশ্য বেশিরভাগ সময় দেখা গেছে ডজসন গবেষণা করতে গিয়ে সব গুবলেট করে ছেড়েছে। যদিও পরের আইডিয়া চুরি করে নিজের নামে চালাতে কখনোই বাঁধেনি তার। এখন যে কোম্পানীতে আছে ডজসন সেই বায়োসিন-এর রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কাজ প্রতিযোগীদের পণ্যের মান পরীক্ষা করা হলেও আসলে এদের কাজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজগিরি করা। ডজসন এই বিভাগের প্রধান।

জেফ রোসিটার ডজসনকে পছন্দ করেন না এবং যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। কারণ ডজসন এত বেশি ঝুঁকি নেয় যে ব্যাপারটা তাঁকে সবসময় অস্বস্তির মধ্যে রাখে। কিন্তু রোসিটার জানেন আধুনিক বায়োটেকনোলজির এই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতামূলক যুগে টিকে থাকতে হলে সব কোম্পানীতেই ডজসনের মত ধুরন্ধর লোক দরকার। আর ডজসন নিজের কাজটা বোঝেও খুব ভাল।

সরাসরি কাজের কথায় আসি, ডজসন ঘুরে দাঁড়াল রোসিটারের দিকে। যদি দ্রুত কাজ করতে পারি, তাহলে আমার বিশ্বাস ইনজেন টেকনোলজি হাতের মুঠোয় পাবার একটা সুযোগ আমাদের আসবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রোসিটার, আর না....'

আমি জানি জেফ, আপনি কি ভাবছেন। তবে এখানে একটা কথা আছে।

কথা? কথা একটাই যে তুমি ব্যর্থ হয়েছো। নানাভাবে আমরা চেষ্টা করেছি, এমনকি কোম্পানীটাকে কেনার চেষ্টাও করেছিলাম। কারণ তুমি বলেছিলে তাতে কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু সমস্যা হয়েছে। জাপানীরা ওটা বিক্রি করবে না।

জানি, জেফ। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না—

আমি যা ভুলতে পারি না, বললেন রোসিটার, তা হলো তোমার বন্ধু নেডরিকে আমরা নগদ সাতশ পঞ্চাশ হাজার ডলার ধরিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু বিনিময়ে পাইনি কিছুই।

কিন্তু জেফ—

তারপর আমরা দাই-ইচি ম্যারেজ ব্রোকারকে পাঁচশ হাজার ডলার দিলাম। এখানেও কিছু পেলাম না। ইনজেন টেকনোলজি কেনার সমস্ত প্রচেষ্টাই আমাদের ব্যর্থ হয়েছে।

পৃথিবী বদলাচ্ছে, জেফ, বলল ডজসন, আমি আমাদের কোম্পানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছিলাম। বলতে চাইছিলাম একবিংশ শতাব্দীতে এই কোম্পানীর প্রধান একটি সমস্যার

সমাধানের কথা।

কি সেটা?

ডজসন জানালার বাইরে তাকাল, কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করেই চলছে।

অ্যানিমাল টেস্টিং জেফ। প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা আজকাল হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত দিন যাচ্ছে ততই এ্যানিমাল টেস্টিংয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদ জোরদার হচ্ছে। হয়তো শেষে দেখা যাবে ব্যাকটেরিয়া নিয়েও আমরা পরীক্ষা চালানোর সুযোগ পাব না।

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ঘটবে, জেফ। যতদিন না আমরা এমন কোন প্রাণী আবিষ্কার করতে পারি যেগুলো এক সময় হারিয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। এ ধরনের প্রাণীর ওপর কারো কোন দাবী থাকবে না। কারণ এটার তো বিলুপ্তিই ঘটেছে। কাজেই এটার যদি অস্তিত্ব থাকে এবং আমরা ওটাকে আবিষ্কার করতে পারি তাহলে এই প্রাণীগুলো একান্তই আমাদের নিজস্ব হয়ে যাবে। আর এরা হবে গবেষণার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র। আর আমরা ভাল করেই জানি ডাইনোসরদের এনজাইম এবং হরমোন সিস্টেম স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সিস্টেমের মতই। এখন যেমন কুকুর বা বেড়ালের ওপর ড্রাগ টেস্ট করা হয়, ভবিষ্যতে ছোট ডাইনোসরদের ওপরও সফল পরীক্ষা করা সম্ভব হবে আর তাতে লিগাল চ্যালেঞ্জের সম্ভাবনা থাকবে খুবই কম।

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন রোসিটার। তোমার ধারণা তাই।

আমি জানি। ডাইনোসর কি? বড় ধরনের টিকটিকি, জেফ। আর টিকটিকিদের কেউ পছন্দ করে না। এরা তো আর মায়াকাড়া চেহারার কুকুর নয় যে আপনার হাত চেটে অন্তর আর্দ্র করে তুলবে। টিকটিকির কোন ব্যক্তিত্ব নেই। ওগুলো হলো লেজওলা সাপ।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রোসিটার। কোন মন্তব্য করেন না।

বকবক করেই যেতে লাগল ডজসন।

জেফ, এই যুগে আপনি চাইলেই একটা বাঘকে গুলি করে হত্যা করতে পারবেন না। এখন বাঘদেরও উকিল আছে। কিন্তু একবার কল্পনা করুন, আপনার জন্য নির্বিচার শিকারের বিরাট একটা রিজার্ভ আছে, হয়তো সেটা এশিয়ার মধ্যে কোথাও। সেখানে ধনবান ব্যক্তিরা চাইলেই ফ্রি স্টাইলে টাইরানোসার আর ট্রাইসেরাটপদের হত্যা করতে পারে। কেউ তাদের কিছু বলবে না। জেফ, আমরা ইচ্ছে করলেই ওদের ধরে এনে নিজেদের গবেষণার কাজে লাগাতে পারি। আমার কথা বিশ্বাস করুন।

রোসিটার টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, পকেটে হাত ঢোকানো। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডজসনের দিকে তাকালেন তিনি।

প্রাণীগুলোর অস্তিত্ব সত্যিই আছে?

আস্তে করে মাথা দোলাল ডজসন।

ওদের কোথায় পাওয়া যাবে জান তুমি?

আবার মাথা দোলাল ডজসন।

বেশ, বললেন রোসিটার। তাহলে কাজে লেগে যাও।

দরজার দিকে এগুলেন রিসোটার। হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। কিন্তু লিউ, বললেন তিনি, একটা কথা মনে রেখো-এবারই কিন্তু শেষ চান্স। হয় প্রাণীগুলোকে

নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে নয়তো এ নিয়ে আর কোনদিন কথা বলবে না। আবার বলছি এটাই শেষ সুযোগ।

চিন্তা করবেন না, বলল ডজসন, এবার আর আমি ব্যর্থ হব না।

দশ

ডঃ জ্যাক থর্নের ভয় ভয় লাগছে। তার চিফ ফোরম্যান এডি কারের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে আছে। একটু আগে দেখা দৃশ্যটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

ডঃ থর্ন আয়ান ম্যালকম এবং এডিকে নিয়ে কিছুক্ষণ আগে হেলিকপ্টারে করে ইসলা সোরনা দ্বীপে এসে পৌঁছেছেন। দুর্গম দ্বীপে অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়ে খোলা একটা ঘাস জমিতে ল্যান্ড করেছেন তারা। অভিযাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে হেলিকপ্টার। কার্গো কন্টেইনারে এক্সপ্লোরারকেও আনা হয়েছে। তারপর ডঃ থর্নরা রিচার্ড লেভিনের খোঁজে রাডারের নির্দেশ মত উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। মিনিট দশেক পরে তারা ছোট একটি নদীর তীরে এসে হাজির হন। ওখানে চামড়ার ব্যাগের ছেঁড়া একটা অংশ চোখে পড়ে তাদের। টুকরোটা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন এটা লেভিনেরই ব্যাগের অংশ। সামান্য দূরে কাদার ওপর ব্যাগের আরেকটা অংশ খুঁজে পায় এডি। ঠিক তখন সবার চোখে পড়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙের গিরগিটির মত কতগুলো প্রাণীকে। আকারে মুরগীর চেয়ে বড় নয় কোনটাই, সব ক'টা এক সাথে কিচিরমিচির করছিল। ওগুলো কোম্পি। সবচেয়ে ক্ষুদে ডাইনোসর. ম্যালকমের কাছে তথ্যটা জেনে বিস্মিত হয় এডি। কারণ ডাইনোসরের সাইজ মুরগীর মত হতে পারে তা তার কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এক্সপ্লোরার নিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে এডির বিস্ময় পরিণত হয় নির্জলা আতঙ্কে। জঙ্গলের পরেই ওরা এসে পড়েছিল দু'মুখো একটা রাস্তার সামনে। কাঠের একটা ম্লান হয়ে যাওয়া সাইনবোর্ডে দু'দিকের রাস্তারই নির্দেশনা ছিল। ওরা ডানদিকে, সাইটি বি লেখা রাস্তায় ঢুকে পড়ে গাড়ি নিয়ে। খানিক এগোতেই চোখে পড়ে দৃশ্যটা।

ঠিক সামনে, রাস্তার মাথায় বিশালদেহী এক প্রাণী, আকারে জলহস্তীর মতো, গায়ে বড় বড় আঁশ, মাথায় মস্ত বাঁকানো হাড়ের চূড়োতে দু'টো ভোঁতা শিং, তৃতীয় শিংটা ঠিক নাকের ডগায় উঁচিয়ে আছে, বাদামী রঙের বীভৎস চেহারার দানবটা হেলে দুলে এগোচ্ছিল। আর তার পরপরই প্রথমটার চেয়ে দ্বিগুণ আকারের আরেকটা প্রাণীও স্বচ্ছন্দ গতিতে ছোটটার পেছন পেছন হাঁটছিল।

দুটো প্রাণীই এক প্রজাতির- ট্রাইসেরাটপ, ম্যালকম জানায় এডিকে। প্রথমটা বাচ্চা ডাইনোসর, দ্বিতীয়টা তার মা জেনে এডির চোখ কপালে উঠেছিল। কিন্তু এডির আত্মা ভয়ে শুকিয়ে যায় আরো পরে।

ট্রাইসেরাটপ্স দুটো এডিদের গাড়ির দিকে একবারও নজর দেয়নি, আপন মনে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে চোখের সামনে থেকে।

ঠিক তখন অভিযাত্রীদের চোখে পড়ে রাস্তার শেষ মাথায় বেশ বড় একটা ফাঁকা জায়গা, একটা বড় জলার মত, তারপর একটা বেশ বড় নদী। আর নদীটির দুই তীরে অসংখ্য

ডাইনোসর গিজগিজ করছে। কমপক্ষে গোটা কুড়ি মাঝারী সাইজের গাঢ় সবুজ রঙের ডাইনোসার নদী তীরে ঘাসের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে কি যেন খাচ্ছে, গোটা আটেক হাঁসঠোঁটি ডাইনোসর পানি খেতে ব্যস্ত। একটা বিরাট স্টেগোসারাস, পিঠে কাঁটা বোঝাই, দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ট্রাইসেরাটপদের একটা দঙ্গল তার পাশ কেটে গেলেও সেদিকে নজর দিচ্ছে না সে। আর পশ্চিম দিকে লম্বা লম্বা গাছের মাথার ওপর দিয়ে জিরাফের মত ঘাড় বের করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আর কি যেন চিবাচ্ছে ধীরে ধীরে ডজন খানেক অ্যাপাটোসারাস। গোটা দৃশ্যে ভয়াল বা ভয়াবহতা কিছু নেই– কিন্তু মনে হচ্ছে এ যেন এক অন্য পৃথিবীর দৃশ্য।

বইয়ের পাতা আর ছবিতেই এডি কার ডাইনোসর দেখেছে। চিরদিন শহুরে সভ্যতায় অভ্যস্ত এডি গহীন এই অরণ্যে এসে সিঁটিয়ে গেছে ভয়ে। ডঃ থর্নের চোখে এডি হলো মেকানিক্যাল যাদুকর। যে কোন জিনিস তৈরি করতে বা জুড়ে দিতে এডির জুড়ি নেই। কোন্ যন্ত্র কিভাবে কাজ করে এডি তা একবার চোখ বুলিয়েই বলে দিতে পারে। এক্সপ্লোরার নিয়ে দুর্গম এলাকায় যাতে বিপদে পড়তে না হয় সে জন্য ডঃ থর্ন এডিকে সাথে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তিনিও কল্পনা করেননি সত্যি সত্যি প্রাগৈতিহাসিক জীবগুলোকে এভাবে নির্দ্বিধায় চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখবেন। ওগুলোর কোন একটা নদী আর জলা পার হয়ে যদি তাদের দিকে তেড়ে আসে! ভাবতেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল ডঃ থর্নের।

এডি এবং আয়ান ম্যালকমের মত চোখ বড় বড় করে সমতল ভূমিতে ডাইনোসরদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন ডঃ থর্ন। হাঁসঠোঁটি ডাইনোসরদের মৃদু চিৎকার ভেসে এল কানে। ঠিক তখন ড্যাশবোর্ড থেকে তীক্ষ্ণ বিপ বিপ আওয়াজ শুরু হলো। জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সেন্সর) ম্যাপে নীল একটা রেখা ফুটে উঠেছে, ত্রিভুজাকৃতির একটা চিহ্ন নির্দেশ করেছে LEVN লেখা অক্ষরগুলোকে। আলো জ্বলছে ওখানে।

'পেয়েছি ওনাকে' বলল এডি। এ লেভিন না হয়েই যায় না। সংকেতটা ঐ উপত্যকা থেকে আসছে।

এক্সপ্লোরারে স্টার্ট দিল এডি। রিচার্ড লেভিনের একটা হদিশ পাবার আনন্দ তার সাময়িক আতংকটাকে কাটিয়ে দিয়েছে অনেকটাই। চলুন, বলল সে, এই নরক থেকে দ্রুত কেটে পড়ি।

পেছনের ট্রেলারটা চালাচ্ছিলেন ডঃ থর্ন নিজে। এডি এগোতে তিনিও ট্রেলার নিয়ে এক্সপ্লোরারের পিছু নিলেন।

চারপাশের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে যেন আবার ওদেরকে গ্রাস করতে শুরু করল। মাথার ওপরের গাছগুলো সূর্যের আলো প্রায় ঢুকতেই দিচ্ছেনা। গাড়ি চালাতে চালাতে এডি দেখল বিপ-বিপ শব্দটা ক্রমশ যেন অনিয়মিত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। সে মনিটরের দিকে তাকাল দেখল আলোকিত ত্রিভুজটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর ফিরে এল আবার।

ওকে আমরা হারিয়ে ফেলছি নাকি, এডি? জানতে চাইলেন থর্ন।

ফেললেও অসুবিধে নেই, বলল এডি। ওর অবস্থান তো জানতে পেরেছি, এখন সোজা ওখানে পৌঁছুতে পারলেই হলো। হতে পারে জায়গাটা রাস্তার আশেপাশে কোথাও, কিংবা সামনের ঐ গার্ড হাউসে।

ডঃ থর্ন সামনের দিকে তাকালেন। কংক্রিটের একটা দালান আছে ওখানে, ইস্পাতের

রোড ব্যারিয়ারসহ। দেখতে অবিকল গার্ড হাউসের মত। করুণ অবস্থা দালানটার, লতাপাতায় প্রায় ঢেকে আছে। গাড়ি চালিয়ে ওরা শান-বাঁধানো রাস্তায় উঠে এল। ওখানে গাছপালা কেটে সাফ করা হয়েছে, রাস্তার দু'পাশে অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট জায়গা ফাঁকা। প্রথম গার্ড হাউস পেরিয়ে ওরা দ্বিতীয় গার্ড হাউস এবং চেক পয়েন্টে পৌঁছল। তারপর আরো শ' গজের মত এগিয়ে গেল সামনের দিকে। রাস্তাটা এখনো পাহাড়ের ধারে বাঁক নিয়ে চলেছে। এদিকে জঙ্গল তেমন ঘন নয়। ঝোপঝাড়ের ফাঁকে থর্ন প্রায়ই কাঠের তৈরি সবুজ রং করা ছোট ছোট ঘরবাড়ি দেখতে পেলেন। গুদাম ঘরটর হবে। তার মনে হতে লাগল তারা আসলে বড় একটা কমপ্লেক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।

ঠিক তখন, হঠাৎ একটা মোড় ঘুরতেই গোটা কমপ্লেক্স ভেসে উঠল তাদের চোখের সামনে, আধা-মাইল দূরে।

এডি বলল, আরে, ওটা কি?

অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখলেন ডঃ থর্ন। সামনে, ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে, সমতল ছাদের বিরাট একটা দালান। দুটো ফুটবল খেলার মাঠের সমান বড় দালানটা। ওটার পেছনে আরেকটা বড় বিল্ডিং, এটার ছাদ ধাতব। পাওয়ার প্ল্যান্ট জাতীয় কিছু হবে।

মূল দালানের শেষ প্রান্তে লোডিং ডক। তার ডানে অল্প ঝোপঝাড়ে ঢেকে যাওয়া ছোট কতগুলো কাঠামো, হতে পারে কটেজ। এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। তবে গোটা কমপ্লেক্স দেখে থর্নের মনে হলো তারা কোন শিল্প কারখানায় ঢুকে পড়েছেন, কিংবা কোন ফ্যাব্রিকেশন প্লান্টে।

ভুরু কুঁচকে ম্যালকমকে জিজ্ঞেস করলেন ডঃ থর্ন। জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছে?

হ্যাঁ, আস্তে মাথা দোলাল ম্যালকম। মনে মনে একটু আগে যা ভেবেছিলাম তাই।

কি?

ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, বলল ম্যালকম, এক ধরনের ফ্যাক্টরি।

কিন্তু আকারে বেশি বড় বললেন, থর্ন।

হ্যাঁ, সায় দিল ম্যালকম। বড় করে বানাতে হয়েছে।

এই সময় রেডিওতে এডি বলল, আমি লেভিনের কাছ থেকে সংকেত পাচ্ছি। আর সংকেতটা আসছে কোথেকে জানেন? ঐ বিল্ডিং থেকে। মেইন বিল্ডিংয়ের সামনের দিকের প্রবেশ পথ পার হলো ওরা। কংক্রিট আর কাঁচের তৈরি বিল্ডিংটা আধুনিক কাঠামোর, তবে লতাপাতা আর ঝোপঝাড় ঘিরে আছে ওটাকে। আঙুর লতা ঝুলছে ছাদ থেকে। জানালাগুলোর একটার কাঁচও আস্ত নেই, কংক্রিটের দেয়ালের ফোকরে শ্যাওলার আস্তরণ।

থর্ন জিজ্ঞেস করলেন, এডি? সংকেত পাচ্ছ কোনো?

এডি বলল, জ্বী, ভেতর থেকে। এখন কি করবেন?

ঐ মাঠের ধারে বেস ক্যাম্প করব, আধা মাইল দূরে, বাঁ দিকে একটা জায়গা হাত তুলে দেখালেন ডঃ থর্ন। দেখে মনে হলো এক সময় বিশাল লন ছিল ওখানে। জঙ্গলের সামনে ফাঁকা মাঠের মত লাগছে ওটাকে, গাড়ির ফটোভোল্যাটিক ছাদের জন্য সূর্যতাপ মিলবে প্রচুর। তারপর একটু চারপাশটা ঘুরে দেখব, কথা শেষ করলেন তিনি।

এডি ফিরতি পথের দিকে মুখ করে পার্ক করল এক্সপ্লোরার। থর্ন গাড়িটার পাশে দাঁড় করালেন তাঁর ট্রেলার, বন্ধ করে দিলেন ইঞ্জিন, তারপর নেমে এলেন বাইরে। গরম হাওয়া ঝাপটা দিল চোখে মুখে। ম্যালকম এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। দ্বীপের কেন্দ্রস্থল জায়গাটা, আশ্চর্যরকম নীরব, শুধু পোকামাকড়ের গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

এডি গা আর মুখ থেকে কাপড় দিয়ে পোকা তাড়াতে তাড়াতে ওদের সঙ্গে সামিল হলো, জায়গা বটে একখানা, তাই না? মশা-মাছির চোটে দাঁড়িয়ে থাকা দায়। লেভিনকে এখানেই খুঁজে বের করতে চান? বেল্ট থেকে রিসিভার খুলল সে, সূর্যের আলোয় ডিসপ্লে দেখার চেষ্টা করে বলল, ঐ যে এখনো ওদিক থেকে সংকেতটা আসছে। হাত তুলল সে মেইন বিল্ডিংয়ের দিকে। কি করবেন?

চলো, ওকে খুঁজে বের করি।

ওরা তিনজন এক্সপ্লোরারে এসে বসল, ট্রেলারটাকে পেছনে রেখে দানবাকৃতির পোড়ো বিল্ডিংটার দিকে এগোল।

এগার

মেইন বিল্ডিংয়ের সামনে দুটো বড় সুইংগ্লাস ডোর, তার পিছনের লবিটা অন্ধকার। দরজার কাঁচে ফাটল, ময়লা, ক্রোমের তৈরি ডোর হ্যান্ডলগুলোতে মরিচা ধরেছে।

সম্প্রতি কেউ এই দরজা ব্যবহার করেছে; মন্তব্য করল এডি।

হ্যাঁ; সায় দিলেন থর্ন। অ্যাসোলো বুটের দাগ দেখতে পাচ্ছি মাটিতে। দরজা খুলে ফেললেন তিনি; ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা তিনজন।

গরম, গুমোট এবং স্থির হাওয়া ধাক্কা দিল নাকে। লবিটা ছোট, সাদামাটা। ছাতা পড়েছে কার্পেটে। দেয়ালে ক্রোম ধাতুতে লেখা আমরা ভবিষ্যৎ গড়ি। অক্ষরগুলো প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে লতার ঝাড়ে। ডান দিকে ওয়েটিং এরিয়া, একটা কফি টেবিল আর দুটো লম্বা কাউচ। মলিন এবং নোংরা কাউচ দুটোর একটার ওপর লেভিনের সবুজ ব্যাকপ্যাকটা দেখতে পেল ওরা, কয়েক জায়গায় ছেঁড়া। কফি টেবিলের ওপর দুটো খালি প্লাস্টিক এভিয়ান বোতল, একটা স্যাটেলাইট ফোন, এক জোড়া কাদা মাখানো হাইকিং শর্টস, আর অনেকগুলো দলা-মোচড়া ক্যান্ডিবারের র‍্যাপার। ওদের দেখে সবুজ রঙের একটা সাপ হিলহিলে শরীর নিয়ে চট করে অদৃশ্য হয়ে গেল কাউচের আড়ালে।

এটা তাহলে ইনজেন বিল্ডিং, দেয়ালের লেখাটা দেখে মন্তব্য করলেন ডক্টর থর্ন।

সন্দেহ নেই, বলল, ম্যালকম।

এডি ঝুঁকে লেভিনের ব্যাগের ফুটোয় আঙুল ঢোকাল। সঙ্গে সঙ্গে বড় একটা ইঁদুর লাফ দিয়ে বেরুলো প্যাক থেকে।

খোদা!

কিচকিচ করতে করতে ছুটে পালাল ইঁদুরটা।

এডি সাবধানে প্যাকের ভেতরটা পরীক্ষা করল। বাকি ক্যান্ডিবারগুলো কেউ খাবে বলে মনে হয় না, বলল সে। 'চলুন, ওদিকে যাই; রিসেপশন ডেস্কের পেছন দিকটা দেখাল সে হাত দিয়ে। ওদিক থেকে সংকেত পাচ্ছি।

ধাতব দরজাটায় এক সময় তালা ঝুলত। এখন ভাঙ্গা তালা পড়ে আছে মেঝেয়। দরজা খোলার সময় বিকট শব্দ হল। ওরা খালি একটা করিডোরে এসে ঢুকল। করিডরের এক দিকের দেয়ালের জানালা সব ভাঙ্গা, মেঝেতে শুকনো পাতা আর আবর্জনার স্তূপ। দেয়ালের গায়ে কালচে মত কি যেন শুকিয়ে আছে, সম্ভবত রক্ত। ওরা দেখল করিডোরের রুমগুলোর বেশিরভাগ দরজা খোলা। মেঝের কার্পেট ফুটো করে গজিয়ে উঠা গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে গোটা করিডর জুড়ে। জানালার কাছে, ভাঙ্গা দেয়ালে ঘন হয়ে আছে লতার ঝাড়। ছাদ থেকেও ঝুলছে প্রচুর লতা। থর্ন তার সঙ্গীদের নিয়ে এগোলেন হল ঘরের দিকে। পায়ের চাপে গুড়িয়ে যাওয়া শুকনা পাতার মুড়মুড়ে শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই।

সংকেতটা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, মনিটরের দিকে তাকিয়ে বললেন থর্ন। এই বিল্ডিংয়ের কাছে পিঠে সে কোথাও আছে।

হাতের কাছে প্রথম দরজাটা খুললেন থর্ন। অফিস ঘর একটা। ডেস্ক চেয়ার, দেয়ালে দ্বীপের একটা ম্যাপ, ডেস্ক ল্যাম্প, কম্পিউটার মনিটর, মোড়ানো ফিল্ম সবই আছে। ঘরের শেষপ্রান্তে ঝুলকালি মাখা একটা জানালা দিয়ে অল্প আলো আসছে।

হল ঘরের দ্বিতীয় দরজা খুলেও ওরা প্রথমটার মত আরেকটা অফিস ঘর দেখতে পেল। এক এক করে চারটে দরজা খুলল, সবগুলোই একই চেহারার এক ধরনের আসবাবে সাজানো। কিন্তু পঞ্চম দরজাটা খুলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো ওদেরকে। এটা একটা কনফারেন্স রুম, শুকনো পাতা আর আবর্জনায় বোঝাই। ঘরের মাঝখানে, লম্বা একটা কাঠের টেবিলে প্রাণীর বিষ্ঠা। একদিকের গোটা দেয়াল জুড়ে বিরাট একটা ম্যাপ। ম্যাপের গায়ে বিভিন্ন রঙের পিন গাঁথা। ম্যাপের নিচে একটা চেষ্ট অভ ড্রয়ার। থর্ন টেনে খুলতে চাইলেন। তালা মারা। ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল এডি। কিসের ম্যাপ এটা? জিজ্ঞেস করল সে। ঐ পিনগুলোই বা কিসের জন্য?

ম্যালকম বলল, মনে হচ্ছে নেটওয়ার্কের মত কোন ব্যাপার।

আর্বি বলেছিল না এ দ্বীপে নেটওয়ার্ক থাকতে পারে?

হ্যাঁ বলেছিল, বেশ ইন্টারেস্টিং.....

ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে, বাধা দিলেন থর্ন। হল ঘরে আবার চলে এলেন তিনি, হ্যান্ড ইউনিট থেকে সংকেত পেয়ে। ম্যালকম দরজা বন্ধ করে তাঁকে অনুসরণ করল। আরো অফিস চোখে পড়ল হাঁটার সময়, তবে দরজা খোলা নেই একটিরও।

করিডরের শেষ মাথায় এক জোড়া স্লাইডিং গ্লাস ডোর, তাতে লেখা প্রবেশ নিষেধ শুধু কর্তৃপক্ষের জন্য প্রযোজ্য। নোংরা, অস্বচ্ছ কাঁচের গায়ে প্রায় নাক ঠেকিয়ে উঁকি দিলেন থর্ন, কিন্তু দেখতে পেলেন না কিছুই। ধারণা করলেন দরজার ওপাশে বেশ বড় একটা ঘর আছে, নানা যন্ত্রপাতিসহ। থর্ন ম্যালকমকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ধারণা করতে পার বিল্ডিংটা আসলে কিসের জন্য?

ধারণ নয়, আমি নিশ্চিত জানি এটা কিসের জন্য, জবাব দিল ম্যালকম। ডাইনোসর উৎপাদনের ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট এটা।

কেন, জানতে চাইল এডি। ডাইনোসর উৎপাদন করতে চাইবে কে?

চাইবে না কেউ, বলল ম্যালকম, এ কারণেই ওরা ওটাকে গোপন রেখেছে।

বুঝলাম না, বলল এডি।

হাসল ম্যালকম, এর পেছনে বিরাট এক ইতিহাস আছে।

গল্পটা সংক্ষেপে ওদেরকে বলল আয়ান ম্যালকম।

আশির দশকে জেব্রার মত দেখতে আফ্রিকান একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী, কোয়াগার জন্ম দেয়া হয় ডিএনএ এক্সট্রাকশন টেকনিকের মাধ্যমে। কোয়াগা নামের প্রাণীটির গত শতকেই বিলুপ্তি ঘটেছিল। ওটার ডিএনএ সংগ্রহ করে নতুনভাবে জন্মদানের ব্যাপারটি ভাবিয়ে তোলে অনেককে। বিলুপ্ত একটি প্রাণীর ডিএনএ দিয়ে যদি তাকে আবার পুনর্জনম দেয়া যায় তাহলে ডাইনোসরকে কেন পারা যাবে না। ডাইনোসর বিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকে ডাইনোসরের ডিএনএ-র খোঁজ করে চলেছিলেন। এদের মধ্যে খেয়ালী কোটিপতি জন হ্যামন্ডের লোকও ছিল। তিনি একটা ব্যাখা দেন– যখন ডাইনোসরা জীবিত ছিল তখন নিশ্চই তাদেরকে পোকামাকড় দংশন করেছে, কামড়েছে, রক্ত চুষে খেয়েছে। সে ধরনের পোকামাকড়ের যদি সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের পেটে ডাইনোসরের রক্ত আছে, তাহলে সেই রক্তে ডাইনোসরের ডিএনএ'র সন্ধান পাওয়া যেতে পারে খুব স্বাভাবিকভাবে।

জন হ্যামন্ড সৌভাগ্যবান। একটা মশার সন্ধান পেয়ে যান তিনি আলাস্কার বরফাচ্ছাদিত এক পাহাড়ে। মশাটা বরফের মধ্যে হিমায়িত অবস্থায় ছিল। ওটা কোটি বছর আগে এক জ্যান্ত ডাইনোসরের রক্ত খায়। তারপর যে কোন কারণেই হোক মশাটা ওই পাহাড়ের বরফের মধ্যে আটকে পড়ে। তীব্র ঠান্ডা ডাইনোসরের রক্তটাকে নষ্ট হতে দেয়নি। ওই মশাটা সংগ্রহ করে ওর রক্তের মধ্য থেকে ডাইনোসরের ডিএনএ সংগ্রহ করেন জন হ্যামন্ড। তারপর ল্যাবরেটরীতে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা আর পরিশ্রমের পর তিনি ঐ ডিএনএ থেকে সৃষ্টি করেন ডাইনোসর। যে কোম্পানী থেকে ডাইনোসর সৃষ্টি করা হয় সেটা হ্যামন্ডেরই মালিকানাধীন ইনজেন।

চতুর এবং ধূর্ত ব্যবসায়ী জন হ্যামন্ড কৃত্রিম উপায়ে তৈরি ডাইনোসর দিয়ে পয়সা কামানোর মত্ত এক ধান্ধা করেন ইসলা নুবলার নামে এক দ্বীপে, ইসলা সোরনার উত্তরে, একটি থিম পার্ক তৈরি করেন তিনি। হ্যামন্ডের ইচ্ছে ছিল জনসাধারণের জন্য পার্কটি '৮৯-র দিকে খুলে দেবেন। তিনি বিখ্যাত কিছু ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন পার্ক দেখতে। আয়ান ম্যালকমও ছিল সেই দলে।

কিন্তু, বলল ম্যালকম, পার্কের সিস্টেম হঠাৎ ভেঙে পড়ে, মুক্ত হয়ে যায় ডাইনোসররা। বেশ কিছু ভিক্টিম খুন হয়। তারপর পার্কের সমস্ত ডাইনোসরদের ধ্বংস করা হয়।

জানালা দিয়ে সমতল ভূমি দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার, ওখানে নদীর তীরে ডাইনোসরের দল ইতস্তত বিচরণ করছে। সেদিকে তাকিয়ে ডঃ থর্ন জিজ্ঞেস করলেন, সব ডাইনোসর যদি ধ্বংস হয়ে থাকে তাহলে ওগুলো কি?

এই দ্বীপটার কথা, বলল ম্যালকম। আমার ধারণা জন হ্যামন্ড কাউকেই বলেননি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বিল্ডিংএ ডাইনোসর ব্রিড করা হতো। কিন্তু সে কথা কেউ কোন দিন জানতে পারেনি। হ্যামন্ডের থিম পার্ক আসলে ছিল একটা শো। এই দ্বীপেই তিনি ডাইনোসর ব্রিড দেয়ার আসল কাজটি করতেন।

বুঝলাম না, বলল এডি।

হাসল ম্যালকম, এর পেছনে বিরাট এক ইতিহাস আছে।

গল্পটা সংক্ষেপে ওদেরকে বলল আয়ান ম্যালকম।

আশির দশকে জেব্রার মত দেখতে আফ্রিকান একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী, কোয়াগার জন্ম দেয়া হয় ডিএনএ এক্সট্রাকশন টেকনিকের মাধ্যমে। কোয়াগা নামের প্রাণীটির গত শতকেই বিলুপ্তি ঘটেছিল। ওটার ডিএনএ সংগ্রহ করে নতুনভাবে জন্মদানের ব্যাপারটি ভাবিয়ে তোলে অনেককে। বিলুপ্ত একটি প্রাণীর ডিএনএ দিয়ে যদি তাকে আবার পুনর্জনম দেয়া যায় তাহলে ডাইনোসরকে কেন পারা যাবে না। ডাইনোসর বিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকে ডাইনোসরের ডিএনএ-র খোঁজ করে চলেছিলেন। এদের মধ্যে খেয়ালী কোটিপতি জন হ্যামন্ডের লোকও ছিল। তিনি একটা ব্যাখ্যা দেন– যখন ডাইনোসরা জীবিত ছিল তখন নিশ্চই তাদেরকে পোকামাকড় দংশন করেছে, কামড়েছে, রক্ত চুষে খেয়েছে। সে ধরনের পোকামাকড়ের যদি সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের পেটে ডাইনোসরের রক্ত আছে, তাহলে সেই রক্তে ডাইনোসরের ডিএনএ'র সন্ধান পাওয়া যেতে পারে খুব স্বাভাবিকভাবে।

জন হ্যামন্ড সৌভাগ্যবান। একটা মশার সন্ধান পেয়ে যান তিনি আলাস্কার বরফাচ্ছাদিত এক পাহাড়ে। মশাটা বরফের মধ্যে হিমায়িত অবস্থায় ছিল। ওটা কোটি বছর আগে এক জ্যান্ত ডাইনোসরের রক্ত খায়। তারপর যে কোন কারণেই হোক মশাটা ওই পাহাড়ের বরফের মধ্যে আটকে পড়ে। তীব্র ঠান্ডা ডাইনোসরের রক্তটাকে নষ্ট হতে দেয়নি। ওই মশাটা সংগ্রহ করে ওর রক্তের মধ্য থেকে ডাইনোসরের ডিএনএ সংগ্রহ করেন জন হ্যামন্ড। তারপর ল্যাবরেটরীতে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা আর পরিশ্রমের পর তিনি ঐ ডিএনএ থেকে সৃষ্টি করেন ডাইনোসর। যে কোম্পানী থেকে ডাইনোসর সৃষ্টি করা হয় সেটা হ্যামন্ডেরই মালিকানাধীন ইনজেন।

চতুর এবং ধূর্ত ব্যবসায়ী জন হ্যামন্ড কৃত্রিম উপায়ে তৈরি ডাইনোসর দিয়ে পয়সা কামানোর মত এক ধান্ধা করেন ইসলা নুবলার নামে এক দ্বীপে, ইসলা সোরনার উত্তরে, একটি থিম পার্ক তৈরি করেন তিনি। হ্যামন্ডের ইচ্ছে ছিল জনসাধারণের জন্য পার্কটি '৮৯-র দিকে খুলে দেবেন। তিনি বিখ্যাত কিছু ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেছিলেন পার্ক দেখতে। আয়ান ম্যালকমও ছিল সেই দলে।

কিন্তু, বলল ম্যালকম, পার্কের সিস্টেম হঠাৎ ভেঙে পড়ে, মুক্ত হয়ে যায় ডাইনোসররা। বেশ কিছু ভিক্টিম খুন হয়। তারপর পার্কের সমস্ত ডাইনোসরদের ধ্বংস করা হয়।

জানালা দিয়ে সমতল ভূমি দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার, ওখানে নদীর তীরে ডাইনোসরের দল ইতস্তত বিচরণ করছে। সেদিকে তাকিয়ে ডঃ থর্ন জিজ্ঞেস করলো, সব ডাইনোসর যদি ধ্বংস হয়ে থাকে তাহলে ওগুলো কি?

এই দ্বীপটার কথা, বলল ম্যালকম। আমার ধারণা জন হ্যামন্ড কাউকেই বলেননি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস-এই বিল্ডিংএ ডাইনোসর ব্রিড করা হতো। কিন্তু সে কথা কেউ কোন দিন জানতে পারেনি। হ্যামন্ডের থিম পার্ক আসলে ছিল একটা শো। এই দ্বীপেই তিনি ডাইনোসর ব্রিড দেয়ার আসল কাজটি করতেন।

কিন্তু এই দ্বীপের ডাইনোসরগুলো ধ্বংসে হল না কেন? জিজ্ঞেসে করলেন থর্ন।

তার ব্যাখ্যাও আমি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছি, বলল ম্যালকম। ইসলা নুবলারের মত কোন সমস্যা এখানে নিশ্চয়ই সৃষ্টি হয়েছিল। হয়তো নবজাতক শিশু ডাইনোসরদের বাঁচিয়ে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল কোন কারণে। উপায় না দেখে ওগুলোকে তারা ছেড়ে দেয়।

হুম, মাথা দোলালেন থর্ন, আমারও তাই ধারণা।

ডাইনোসরদের এই দ্বীপে ওরা ছেড়ে দিল? অবাক হল এডি, ওরা পাগল নাকি?

ওরা বোধহয় বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল; ব্যাখ্যা করল ম্যালকম। ভেবে দেখ, একদিকে এত খরচ করে ডাইনোসর ব্রিডিং হচ্ছে, অন্যদিকে সেগুলো কোন বিশেষ কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, মারা যাচ্ছে। হ্যামন্ড নির্ঘাত রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন। অনন্যোপায় হয়ে তিনি জঙ্গলে ছেড়ে দেন ডাইনোসারদের। অবশ্য প্রাণীগুলো বড় হলে এখান থেকে কিছু ডাইনোসর নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর থিম পার্কে। কিন্তু শেষদিকে আর শেষ রক্ষা করতে পারেননি জন হ্যামন্ড।

বার

ডঃ জ্যাক থর্ন, আয়ান ম্যালকম এবং এডি পরিত্যক্ত বিশাল বিল্ডিংটা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এটা একটা ক্লিন রুম, ঘরের এক কোণে, দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গার নীল রঙের ছোট একটা বাক্স চোখে পড়ল। এটা এক ধরনের ইলেকট্রিক্যাল জংশন বক্স, বাক্সের মাথায় ছোট্ট একটা লাল বাতি জ্বলছে।

বাতিটাকে জ্বলতে দেখে লাফিয়ে উঠল এডি। ডঃ! এদিকে নিশ্চয়ই কোথাও পাওয়ার হাউজ আছে। নইলে পাঁচ বছর ধরে ব্যাটারী দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব নয়। চলুনতো, খুঁজে দেখি।

এডির ধারণা সত্যি বলে প্রমাণ হলো। মেইন বিল্ডিংয়ের পেছন দিকে সত্যি একটা পাওয়ার স্টেশন আছে। জানালা শূন্য আকৃতিহীন কংক্রিটের একটা ব্লক হাউস। পেছনে একটা ভারী ইস্পাতের দরজা, তার মাথায় লেখা ঃ সাবধান! হাই ভোল্টেজ! প্রবেশ নিষেধ। দরজা পার হয়ে ওরা তিনজন একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরটাতে অনেকগুলো পাইপ ছড়ানো ছিটানো, মেঝে থেকে বাষ্প উঠছে। অসম্ভব রকম গরম ঘরটা। উঁচু, ঘরঘরে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে অনবরত।

একটু খুঁজতেই শব্দের উৎসের সন্ধান মিলল। একটা বড়, গোল টারবাইন থেকে শব্দটা আসছে। টারবাইনের ব্লেডগুলো ঘুরছে, সেই সাথে ঘরঘরে আওয়াজটা হচ্ছে। বাতাসে সালফারের গন্ধ।

জিওথারমাল টেকনিকে এখানে পাওয়ার উৎপন্ন হচ্ছে, অন্য দু'জনকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল এডি। এখানে ওরা গ্যাস বা বাষ্প ঐ পাইপগুলোতে ভরে রেখেছিল। বাষ্পের তাপে পানি ফুটত, ঐ পানির শক্তিতে ঘুরত টারবাইন– আর টারবাইনের সাহায্যে উৎপন্ন হতো বিদ্যুৎ। তবে গ্যাস বা বাষ্পের হিট সোর্সটা কি আমি জানি না। কিন্তু জিওথারমাল টেকনিকে তো বেশিদিন পাওয়ার উৎপন্ন হবার কথা নয়। এখানে এটা চলছে কিভাবে কে জানে!

এক দেয়ালের পুরোটা জুড়ে মেইন প্যানেল, এখান থেকে গোটা ল্যাবরেটরী কমপ্লেক্সে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে।

দেখে তো মনে হয় না গত কয়েক বছরে কেউ এখনো পা দিয়েছে, বলল এডি। আর বেশিরভাগ পাওয়ার গ্রিড অকেজো। কিন্তু প্ল্যান্টটা কি করে চলছে খোদা জানে?

সালফার বোঝাই বাতাসে কাশতে কাশতে ওরা পাওয়ার স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল। হঠাৎ বৈদ্যুতিক হিস্‌স্ শব্দে চমকে উঠল সবাই। শব্দটা আসছে এক্সপ্লোরারের ভেতর থেকে। উদ্বিগ্ন এডি দ্রুত পা বাড়াল গাড়ির দিকে।

দরজা খুলে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। হ্যান্ডসেটটা তুলে অটোম্যাটিক টিউনারের বোতামে চাপ দিল। জানালা দিয়ে দেখল থর্ন এবং ম্যালকম তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছেন এক্সপ্লোরারের দিকে।

এমন সময় ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়ে গেল– গাড়িতে উঠুন, বলে উঠল ভীত একটা কণ্ঠ। ডঃ থর্ন, ডঃ ম্যালকম, বলে চলল কচি কণ্ঠটা। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়ুন।

সাথে সাথে গলাটা চিনে ফেলল এডি। থর্ন কাছে আসতে সে বলল, ডক্টর সেই খুদে ছোঁড়াটা।

কি? অবাক হলেন থর্ন।

হ্যাঁ। আর্বি কথা বলছে।

রেডিওতে আর্বির গলা আবার ভেসে এল, শিগগির গাড়িতে উঠুন। ওটা এদিকে আসছে। দেখতে পাচ্ছি আমি!

ভ্রু কোঁচকালেন ডঃ থর্ন। কার কথা বলছে? আর্বি এই দ্বীপে নেই তো!

খড়খড় করে উঠল রেডিও, হ্যাঁ, আমি এখানেই আছি! ডঃ থর্ন।

কিন্তু ও কি করে–

ডঃ থর্ন। গাড়িতে উঠুন।

রাগে বেগুনী হয়ে গেল থর্নের চেহারা। হাতের তালুতে ঘুষি মারলেন তিনি। খুদে শয়তানটা এখানে এল কি করে? টান মেরে এডির কাছ থেকে হ্যান্ডসেটটা ছিনিয়ে নিলেন তিনি। আর্বি, খোদার কসম–

ওটা আসছে! টিভিতে ওকে দেখতে পাচ্ছি, ডঃ থর্ন।

ম্যালকম জঙ্গলে একবার চোখ বোলাল। আমাদের বোধহয় গাড়িতে উঠে পড়াই ভাল, বলল সে শান্ত গলায়।

টেলিভিশনের কথা কি যেন বলল ও? রাগে এখনো কাঁপছেন থর্ন।

এডি বলল, ঠিক জানি না। তবে ট্রেলারে থাকলে ওকে দেখতে পাবে। ড্যাশবোর্ড মনিটরের সুইচ টিপল সে। আলোকিত হয়ে উঠল পর্দা।

সেই হতচ্ছাড়াটাই, বললেন ডঃ থর্ন। আমি এক্ষুনি ওর ঘাড়টা মুচড়ে দেব।

ঠিক তখন মনিটরে কি যেন দেখে আঁতকে উঠল এডি। মাই গড!

ড্যাশবোর্ড মনিটরের খুদে পর্দায় রক্তহিম করা দৃশ্যটা সবাই দেখতে পেল। একটা বিশালদেহী টাইরানোসরাস এক্স, গেম ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। লালচে বাদামী জন্তুটার গায়ের রঙ যেন শুকিয়ে যাওয়া রক্ত। পিঠের ওপর শক্তিশালী পেশীগুলো সূর্যালোকে স্পষ্ট দেখা গেল। ভয় বা ইতস্তত কোন ভাব নেই ওটার মধ্যে, মুভমেন্ট বেশ দ্রুত।

প্রাগৈতিহাসিক দানবটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ডঃ থর্ন শুধু একটা কথাই বলতে পারলেন, সবাই গাড়িতে ওঠো।

হুড়মুড়িয়ে গাড়িতে ঢুকল ওরা। ক্যামেরা রেঞ্জের বাইরে চলে যাওয়ায় টাইরানোসার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল মনিটর থেকে। কিন্তু এক্সপ্লোরারে বসে থেকেও ওটার অস্তিত্ব পরিষ্কার টের পাওয়া গেল। বোঝা গেল ওটা গাড়ির দিকেই আসছে। কারণ পায়ের নিচে মাটি থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে, আলতোভাবে দুলছে এক্সপ্লোরার।

থর্ন জিজ্ঞেস করলেন, আয়ান? কি করব এখন?

জবাব দিল না আয়ান ম্যালকম। জমে গেছে সে, মূর্তির মত বসে আছে, চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে।

আয়ান? আবার ডাকলেন থর্ন।

ক্লিক করে উঠল রেডিও। জানতে চাইল আর্বি, ডঃ থর্ন আমরা মনিটরে ওটাকে দেখতে পাচ্ছি না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন?

ঠিক তখন টাইরানোসারাস রেক্সকে দেখা গেল, এক্সপ্লোরারের ডানদিকের জঙ্গল বিস্ফোরিত হয়েছে, বিপুল বেগে ছুটে এল ওটা। জন্তুটা দোতলা বাড়ির সমান, মাথা এত উঁচুতে দেখাই গেল না। এত বিশাল দেহ নিয়েও ওটার গতি অত্যন্ত দ্রুত। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না ডঃ থর্নের। দানবটার প্রতিটি পদক্ষেপে কেঁপে উঠছে মাটি। ভয়ে গুঙিয়ে উঠল এডি।

কিন্তু টাইরানোসরাস এক্স গ্রাহ্য করল না ওদেরকে। সমান গতি বজায় রেখে এক্সপ্লোরারের সামনে দিয়ে চলে গেল সে। বাঁ দিকের জঙ্গলে ভারী মাথা এবং শরীর নিয়ে বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা শুধু মোটা, প্রায় সাতফুট লম্বা লেজটাকে দেখল চলার তালে দু'পাশে নড়তে।

এক্সপ্লোরারের সামনে দিয়ে লেজটা দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ ওটা বাড়ি খেল গাড়ির গায়ে, ধাতব আওয়াজ উঠল সজোরে।

দাঁড়িয়ে পড়ল টাইরানোসার।

জঙ্গলের ভেতর থেকে নিচু লয়ের গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। লেজটা আবার আগের মত বাতাসে নড়তে শুরু করল। তারপর আবার রেডিয়েটরের গায়ে হালকাভাবে ধাক্কা খেল।

ওরা দেখল বাঁদিকের ঝোপ হঠাৎ নিচু হয়ে এল, শোনা গেল সড়সড়ে একটা শব্দ, পরমুহূর্তে লেজটা ঢুকে গেল ওটার ভেতর।

কারণ, আতঙ্কিত হয়ে ভাবলেন থর্ন, এবার টাইরানোসারটা আমাদেরকে হামলা করতে আসছে।

ঠিক তাই। জঙ্গলের মাঝ থেকে আবার আবির্ভাব ঘটল প্রাগৈতিহাসিক দানবের। সরাসরি এক্সপ্লোরার লক্ষ্য করে এগোল, দাঁড়িয়ে পড়ল একেবারে সামনে। আবার গোঁ গোঁ করে উঠল। মেঘ ডাকল যেন মাথাটা এদিক ওদিক ঘোরাতে শুরু করল, নতুন এবং আজব জিনিসটাকে পরখ করছে। তারপর মাথা নিচু করল দানব, থর্ন দেখতে পেলেন টাইরানোসারের দুই চোয়ালের মাঝখানে একটা প্রাণীর পা ঝুলছে। মাছি বিজবিজ করছে ওটার মাথায়।

প্রায় কেঁদে ফেলল এডি। বাঁচাও! খোদা!

চুপ, ফিসফিস করে বললেন থর্ন।

টাইরানোসারাস নাক কুঁচকে গন্ধ নিল, তাকাল গাড়ির দিকে। মাথা নামাতে শুরু করল। বারবার নাক কোঁচকাচ্ছে, একবার ডানে, আরেকবার বাঁয়ে দোলাচ্ছে মাথাটা। থর্ন বুঝতে পারলেন ওটা রেডিওটারের গন্ধ শুঁকছে, তারপর টায়ারের গন্ধ শুঁকল। এবার ধীরে ধীরে প্রকাণ্ড মাথাটা তুলতে শুরু করল টাইরানোসার, মুখ ঠেসে ধরল জানালার কাঁচে। স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল ভেতরে ভয়ে আধমরা যাত্রীদের দিকে। বারকয়েক চোখ পিটপিট করল ডাইনোসর। চাউনিটা ঠান্ডা সাপের মত।

থর্নের মনে হল দানবটা তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে লক্ষ করছে। ভোঁতা নাক দিয়ে ওটা গাড়ির একদিকে ধাক্কা দিল, দুলে উঠল এক্সপ্লোরার, যেন এটার ওজন পরীক্ষা করছে, পরখ করে দেখছে প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি। থর্ন শ্বাস বন্ধ করে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলেন স্টিয়ারিং হুইল।

হঠাৎ পিছু হঠল টাইরানোসার, হেঁটে এল গাড়ির সামনে। ওদের দিকে পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল, উঁচু করল লেজ। গাড়ির ছাদে লেজ ঘষা খেল সজোরে। শরীরের পেছনের অংশ কাছিয়ে এল দ্রুত।

হুডের ওপর বসে পড়ল টাইরানোসার। দুলে উঠল এক্সপ্লোরার, অতিকায় শরীর আর প্রচণ্ড ওজন দিয়ে বাম্পারটাকে মিশিয়ে দিল সে মাটির সাথে। এক মুহূর্ত ওখানে বসে থাকল দানব, নড়ল না। তারপর দ্রুত উঁচু করতে শুরু করল নিতম্ব, তীব্র ধাতব শব্দ উঠল গাড়ির। লাফিয়ে উঠল এক্সপ্লোরার। টাইরানোসার আর দাঁড়াল না, গেম ট্রেইল ধরে এগোল, ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভেতর।

থর্ন আয়ান ম্যালকমের দিকে তাকালেন। সে আগের মত আড়ষ্টভাবে বসে আছে। দৃষ্টি বিস্ফোরিত। তিনি আয়ানের কাঁধ ছুঁলেন। ডাকলেন, আয়ান?

ম্যালকম বলল, ওটা চলে গেছে?

স্বস্তি ফুটে উঠল আয়ান ম্যালকমের চেহারায়, পেশীতে ঢিল দিল সে। গভীর দম নিয়ে বলল, আপনাকে স্বীকার করতেই হবে এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না।

তুমি ঠিক আছ তো? জিজ্ঞেস করলেন থর্ন।

অবশ্যই। আমি ঠিক আছি, বলল ম্যালকম। অবশ্য ওটা আকৃতিতে ছোট ছিল বলে রক্ষা।

ছোট? জিজ্ঞেস করল এডি। ঐ জিনিসটাকে আপনি ছোট বলছেন?

হ্যাঁ। টাইরানোসাররা সচরাচর যতটা প্রকাণ্ড হয়ে থাকে ওটা তারচেয়ে ছোটই ছিল। মেয়েগুলো তো আরো বিশাল দেহী। এটা পুরুষ ছিল।

এডি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এই সময় বেজে উঠল রেডিও। ডঃ থর্ন, বলল আর্বি। আপনারা ঠিক আছেন তো?

হ্যাঁ আর্বি। ধন্যবাদ তোমাকে। বললেন তিনি।

তাহলে আর অপেক্ষা করছেন কেন, ডঃ থর্ন? ডঃ লেভিনের খোঁজ পেয়েছেন?

এখনো নয়, থর্ন সেন্সর ইউনিটের দিকে হাত বাড়ালেন, জিনিসটা পড়ে আছে মাটিতে।

ওটা তুলে নিলেন তিনি। লেভিনের কো-অর্ডিনেট বদলে গেছে। ও কোথায় যেন যাচ্ছে ...?

হ্যাঁ, জানি, উনি কোথায় যাচ্ছেন। ডঃ থর্ন?

বলো, আর্বি, বললেন, থর্ন। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, দাঁড়াও। দাঁড়াও। তুমি কি করে জানলে লেভিন মুভ করছে?

কারণ ওনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি, জবাব দিল আর্বি। উনি বাইসাইকেলে চড়েছেন। টাইরানোসারটাকে অনুসরণ শুরু করেছেন।

সেকি! দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যালকম কথাটা শুনে। টাইরানোসারকে অনুসরণ! আগে জানলে এই পাগলটার সাথে নিজেকে জড়াতাম না।

আমাদেরও একই মত, বললেন থর্ন। গেম ট্রেইল ধরে তিনি গাড়ি চালাতে শুরু করেছেন।

ট্রেইলটা ক্রমশ সরু হয়ে এল, যেন পাহাড়ের পাশ দিয়ে পারলে নেমে যায় নিচে। একটা বাঁকের কাছে এসে ওদের থমকে দাঁড়াতে হলো। একটা গাছ পড়ে আছে রাস্তায়, বন্ধ করে রেখেছে পথ।

থর্ন গাড়ি থেকে নেমে এক্সপ্লোরারের পেছন দিকে চলে এলেন, ক্যারিয়ার হুক থেকে একটা মোটর সাইকেল বের করলেন। ব্যাটারী চেক করে আবার ফিরে এলেন গাড়ির সামনে। ম্যালকমকে বললেন, আপনার রাইফেলটা দিন তো। সুইডিশ লিনস্ট্রাড্ট এয়ারগানটা থর্নের হাতে তুলে দিল ম্যালকম। বিশ্বের সবচেয়ে দামি রাইফেল এটা। গুলি বদলে তিন ইঞ্চি লম্বা বিষাক্ত সুঁচ ছোঁড়ে। চোখের পলকে শুইয়ে দিতে পারে যে কোন বিশালদেহী প্রাণীকে।

ডঃ থর্ন একাই লেভিনকে খুঁজতে বেরুচ্ছেন দেখে বাধা দিতে গেল এডি। কিন্তু থর্ন বললেন, তোমরা ট্রেলারে ফিরে যাও। বাচ্চা দুটোর ওপর খেয়াল রেখো। আমি একাই কাজটা করতে পারব।

সময় নষ্ট না করে মোটর সাইকেলে উঠে বসলেন ডঃ থর্ন। গেম ট্রেইল ধরে এগোলেন টাইরানোসারটা যে পথে গেছে সে পথে। তাঁর সাথে রেডিওতে যোগাযোগ রেখে চলল আর্বি।

পথে যেতে এক জায়গায় কাটা একটা পা দেখতে পেলেন ডঃ থর্ন। বিকট দুর্গন্ধ। খানিক এগোতে লাশটার খুলি নজরে পড়ল তাঁর। হাড়ের সাথে মাংস এবং সবুজ চামড়া লেগে আছে এখনো, মাছি ভন ভন করছে।

মাইক্রোফোনে ডঃ থর্ন বললেন, আমি একটা লাশ দেখলাম একটু আগে ...

বেজে উঠল রেডিও। এবার ম্যালকম কথা বলছে, আমি ভয় পাচ্ছি ডঃ থর্ন।

কেন?

মনে হয় কাছেপিঠে ডাইনোসরদের বাসা থাকতে পারে। বলল ম্যালকম। টাইরানোসারটার চোয়ালে একটা লাশ দেখতে পেয়েছিলেন? ওটা কিন্তু সে খাচ্ছিল না। সম্ভবতঃ নিজের বাসায় নিয়ে যাচ্ছিল বাচ্চাদের খাওয়াতে।

টাইরানোসারের বাসা ... বললেন ডঃ থর্ন।

সাবধানে থাকবেন, বলে লাইন কেটে দিল ম্যালকম।

একটা পাহাড়ের কাছে এসে বাইকের সুইচ অফ করে দিলেন ডঃ থর্ন। তাঁর পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। সামনে, ঝোপের আড়াল থেকে গুরুগুরু ডাক শোনা যাচ্ছে। চারপাশে মাথা ঘোরালেন ডঃ থর্ন। লেভিনের সাইকেলের চিহ্নও নেই কোথাও।

থর্ন ঘামে ভেজা হাতে রাইফেলটা নিলেন। গুরুগুরু আওয়াজটা একবার চওড়া হচ্ছে আবার অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ঠিক সামনের জঙ্গল থেকে শব্দটা আসছে।

ডঃ থর্ন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানকার গাছগুলো বেশ উঁচু এবং ঘন। কিন্তু সামনে, ঝোপের পরে বোধহয় খোলামত জায়গা আছে, এখান থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আর শব্দটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকেই হচ্ছে। এখন আরো জোরালো হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় বিশ্রীভাবে চিৎকার করে উঠল কি যেন। সামান্য ইতস্তত করে ডঃ থর্ন সামনে এগোলেন। তারপর খুব আস্তে গাছের পাতা ফাঁক করে সামনে তাকাতেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল।

তের

মধ্যাহ্নের ঝকঝকে সূর্যালোকে ডঃ থর্ন দেখতে পেলেন তার সামনে ফুট বিশেক উঁচু অতিকায় দুটো টাইরানোসার হেঁটে বেড়াচ্ছে। দুটোরই গায়ের চামড়া লালচে বর্ণের, প্রকাণ্ড মাথা দুটো ভীতিকর দেখতে, প্রকাণ্ড চোয়ালের ফাঁকে ক্ষুরধার বড় বড় দাঁতের সারি। জন্তু দুটো ফুট চারেক উঁচু একটা শুকনো মাটির ঢিবির কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে দেয়ালের ওপাশে লাল মাংস ভরা মুখ নামাচ্ছে, সাথে সাথে তীক্ষ্ণ শব্দ হচ্ছে। এভাবে কয়েকবার করল টাইরানোসার দুটো। এক সময় থর্ন দেখলেন ওদের মুখে মাংসের ডেলাটা নেই।

কোন সন্দেহ নেই এটা টাইরানোসারের বাসা। আর জন্তু দুটো এতক্ষণ নিশ্চয়ই তাদের বাচ্চাদের খাবার খাইয়েছে। কারণ মাটির ঢিবির আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ শব্দটা শুনেছেন থর্ন, ওটা অবিকল পাখির ডাকের মত। একটু পরে বাচ্চাটাকেও দেখা গেল ঢিবির আড়াল থেকে মুখ তুলতেই। আকারে টার্কির মত, মাথাটা বড়সড়, চোখজোড়া আরো বড়। বাচ্চাদের গা তুলার মত লালচে আঁশে বোঝাই, শরীর লিকলিকে। ঘাড়ে ম্লান সাদা রঙের একটা বৃত্ত আঁকা। বিশালদেহী টাইরানোসার এক টুকরো মাংস ঢিবির ওপর রাখতে বাচ্চা কাঠি কাঠি হাত পা নেড়ে খাবারের দিকে এগোল। নাগালে খাবার পেতেই ক্ষুধার্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, ছোট্ট ধারালো দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল মাংস।

খেতে খেতে বাচ্চাটা হঠাৎ পাখির গলায় ডেকে উঠল, পড়ে যাচ্ছে দেয়ালের ওপর থেকে। বিদ্যুৎ খেলে গেল মা টাইনোসারের বিশাল দেহে, ঝট করে মাথাটা নিচু করে বাচ্চাকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করল, সাবধানে রেখে দিল আগের জায়গায়। বাচ্চার প্রতি মায়ের মমতা দেখে চমৎকৃত হলেন থর্ন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে একটু সরে দাঁড়াতে গিয়ে শুকনো একটা ডালে পা দিয়ে ফেললেন। ডাল ভাঙার শব্দ হলো মট করে।

বিশালদেহী জন্তু দুটো সাথে সাথে ঝাঁকি খেয়ে উঁচু করল মাথা।

জমে গেলেন থর্ন, দম বন্ধ হয়ে এল তাঁর।

টাইরানোসার দুটো তাদের বাসার চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বোলাতে শুরু করল। শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে, এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে ওরা বোধহয় ঢিল দিল পেশীতে।

আবার বাচ্চাদের খাওয়ানোর দিকে নজর দিল।

থর্ন চুপিসারে সরে এলেন ওখান থেকে, মটর সাইকেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর্বি ফিসফিস করে রেডিওতে বলল, ডঃ থর্ন, আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

থর্ন কথা বললেন না। মাইক্রোফোনে আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন, মানে তিনি শুনতে পেয়েছেন। আর্বি আবার ফিসফিস করল। ডঃ লেভিন কোথায় আমি তা জানি, ডঃ থর্ন। আপনার বাঁদিকে আছেন উনি। থর্ন আবার মাইকে টোকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

বাঁদিকে, ঝোপের ভেতর একটা লঝঝরে বাইসাইকেল দেখতে পেলেন তিনি। ওতে লেখা প্রোপ্রাইটার ইনজেন কর্পোরেশন। বাইসাইকেলটা একটা গাছের সাথে হেলান দেয়া।

থর্ন গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাকালেন ওপর দিকে। ঘন পাতার কারণে লেভিনকে দেখতে পেলেন না, তবে তিনি নিশ্চিত লেভিন ওপরে কোথাও আছে। কারণ ওখানে লেভিন কিছু একটা করছে, শব্দ হচ্ছে বেশ।

থর্ন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভাবলেন ওখানে লেভিন করছেটা কি? খুটখুট, খঁচখঁচ নানা বিদঘুটে শব্দ হচ্ছে গাছের মগডাল থেকে। হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা শব্দ হলো। ডাল ভাঙ্গার আওয়াজ, তারপরই বস্তার মত ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল লেভিন। এক গড়ান দিয়ে কাঁধ চেপে উঠে দাঁড়াল সে।

ধ্যাত্তেরি, বলল লেভিন।

লেভিনের পরণে কাদামাখা খাকি শার্ট, কয়েক জায়গা ছেঁড়া, মুখে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। মুখেও লেপ্টে আছে কাদা। থর্নকে দেখে দাঁত বের করে হাসল সে।

আপনাকে দেখে খুশি হলাম, ডক্টর, বলল লেভিন।

ডঃ থর্ন হাত বাড়িয়ে দিলেন লেভিনের দিকে, লেভিন হ্যান্ডশেক করতে যাচ্ছে ঠিক তখন পেছন থেকে কান ফাটানো গর্জন করে উঠল প্রাগৈতিহাসিক দানব দুটো। ঘাড় ফিরিয়ে ডঃ থর্ন যা দেখলেন তাতে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল। ঝোপঝাড় ভেঙ্গে বিকট ডাক ছাড়তে ছাড়তে একটা টাইরানোসার তীব্র গতিতে ছুটে আসছে তাদের দিকে। ওটার মাথা নিচু করা, খুলে আছে চোয়াল, হামলা করার হিংস্র ভাব ফুটে আছে চেহারায়।

পালান! চিৎকার করে উঠল লেভিন। শিগগির পালান।

এক লাফে বাইকে চড়ে বসলেন থর্ন, মোচড় দিলেন থ্রটলে। ইলেকট্রিক মোটর গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়ল, পেছনের চাকা বন বন করে ঘুরতে শুরু করল মাটিতে, কিন্তু নড়ল না।

টাইরানোসারটা ভয়ংকর বেগে গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। পায়ের ওজনে মাটি কাঁপছে। শব্দটা বিস্ফোরণের মত লাগল থর্নের কানে। দানবটা প্রায় তাদের কাছে চলে এসেছে, বিশাল মাথাটা ঝাঁকি খাচ্ছে, সামনের চোয়াল দুটো সম্পূর্ন খোলা।

থর্ন জুতো পরা পা দিয়ে লাথি ছুঁড়লেন মাটিতে, বাইক ঠেলে নিতে শুরু করেছেন। হঠাৎ পেছনের চাকা আটকে গেল, ছুঁড়তে লাগল মাটির স্রোত, গোঁ গোঁ করে গজরাতে থাকল

বাইক। জোরে অ্যাক্সেলেটারে চাপ দিলেন থর্ন। মাটির ফাঁদ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল মোটর সাইকেল, বিপজ্জনকভাবে কাত হতে হতে ছুটতে শুরু করল। পেছন থেকে লেভিন চিৎকার করে কি যেন বলল তাঁকে, কিন্তু শুনতে পেলেন না ডঃ থর্ন। রাস্তায় কিসের সাথে যেন বেঁধে প্রায় উল্টে যাচ্ছিল বাইক। শেষমুহূর্তে পতন ঠেকালেন থর্ন। আবার ফুল স্পীডে ছোটালেন যান। পেছন ফিরে দেখার সাহস হল না। তিনি যেন পচা মাংসের গন্ধ পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন দানবটার তাদেরকে অনুসরণ করার শব্দ, নিঃশ্বাসের আওয়াজ।

ডক্টর আস্তে! চিৎকার করে বলল লেভিন।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল বাইক। ঝোপে বাড়ি খেল মুখ, কাদা ছিটকে উঠে ভূত বানিয়ে দিল একেকজনকে। কিন্তু স্পীড কমালেন না ডঃ থর্ন। এবার একটুর জন্য একটা খাদের মুখে পড়তে গিয়েও বেঁচে গেলেন তারা। আরেকটা গর্জন ভেসে এল ডঃ থর্নের কানে, এবার যেন শব্দটা অনেক দূরে থেকে আসছে।

ডক্টর, কানের কাছে বোমা ফাটাল লেভিন। করছেন কি আপনি? মেরে ফেলবেন নাকি? শুনছেন না আমরা একা!

সমতল রাস্তায় চলে এসেছেন ডঃ থর্ন, এবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাবার সাহস হল তাঁর। ঠিকই বলেছে লেভিন। পেছনে কেউ নেই। যদিও দূর থেকে টাইরানোসারের গর্জন শোনা গেল অস্পষ্টভাবে।

বাইকের গতি কমালেন ডঃ থর্ন। আস্তে আস্তে বলল লেভিন, ভয়ে তার মুখ ছাই হয়ে গেছে, আপনি সাংঘাতিক লোক তো, মশাই, দিয়েছিলেন তো আরেকটু হলো পৈত্রিক প্রাণটা খরচ করে।

দানবটা আমাদের আক্রমণ করতে আসছিল, রেগে গিয়ে বললেন ডঃ থর্ন।

মোটেই না, প্রতিবাদ করল লেভিন। ওটা আসলে আমাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চাইছিল।

ঐ একই হলো, বাইক থামালেন থর্ন। তাকালেন লেভিনের দিকে।

ওটা আমাদের অনুসরণ করলে এতক্ষণে দু'জনেই ভর্তা হয়ে যেতাম, বলল লেভিন! ওটা ভেবেছিল আমরা ওর বাচ্চাদের ক্ষতি করতে এসেছি। তাই হুমকি-ধামকি দিয়ে তাড়িয়েছে। খামোখা ভয় পেয়েছেন আপনি।

বটে! বটে! বিড়বিড় করতে করতে আবার বাইকে স্টার্ট দিলেন ডঃ থর্ন। ফিরে চললেন নিজেদের গন্তব্যে। পেছন থেকে হাসি মুখে লেভিন বলল, আপনাকে দেখে সত্যি খুশি হয়েছি, ডক্টর।

ডঃ থর্ন জবাবে কিছু বললেন না। বেজার মুখে চালাতে লাগলেন বাইক।

চৌদ্দ

রিচার্ড লেভিনকে দেখে তার দুই ছাত্র কেলী এবং আর্বি নেচে কুঁদে অস্থির হলো। লেভিন ওদের দু'জনকে এখানে দেখে তো খুবই অবাক। আনন্দের উচ্ছ্বাস একটু কমতে আর্বি আর কেলী জানাল তাদের এখানে আসার রহস্য।

এক্সপ্লোরার যাত্রার আগে ওরা দু'জন বুদ্ধি করে থর্নের লোকজনের চোখ এড়িয়ে একটা ট্রেলারে উঠে পড়ে। অভিযানে যাবার মতলবটা অবশ্য কেলীই বাতলেছিল। এ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে আর্বি তাতে সাথে সাথে সাড়া দেয়। ঠান্ডায় যাতে জমে না যায় সেজন্য ওরা যে কামরায় লুকিয়ে ছিল ওটার সমস্ত কম্বল গায়ে চাপিয়ে দেয়। আর্বির সব ছিল অংক কষা হিসেব। সে জানত বারঘন্টার মত লাগবে ওদের দ্বীপে পৌছতে। এই সময়ে খিদেয় যাতে কষ্ট পেতে না হয় সে জন্য আর্বি বিস্কুট আর পানির বোতলও জোগাড় করে রেখেছিল। যাত্রার আগে এডি ট্রেলারের সবগুলো স্টোরেজ কম্পার্টমেন্ট বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়। ফলে যাত্রার দীর্ঘ সময়টা গোপন আস্তানা থেকে আর বেরুতে পারেনি। শুধু হিসুর চাপে ওদের খানিকটা সমস্যা হয়েছিল। এছাড়া গোটা পথ বেশ আরামেই এসেছে দু'জন।

আমরা আমাদের বাবা-মাকে না বলেই এসেছি। সবশেষে বলল আর্বি।

সে কি! বলল লেভিন।

আমরা ভাবলাম আপনার হয়তো সাহায্যের দরকার হবে, বলল আর্বি। তাই চলে এসেছি

স্বীকার করলেন থর্ন, ওরা বেশ সাহায্য করেছে আমাদেরকে। দুষ্টমী করলে এতক্ষণে পিটুনী খেত। যাকগে হ্যাঁ, এবার তোমার, গল্প বলো। এখানে এসেছ কি কাজে? আমাদের একটা খবর পর্যন্ত দাওনি।

এখানে আসার কারণটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রিচার্ড লেভিন। উপায় ছিল না আমার, বলল সে, শুনলাম সরকার এখানে পাইকারী হারে নিধনযজ্ঞ শুরু করবে ডাইনোসর চোখে পড়লেই। এগুলো নাকি সংক্রামক রোগ ছড়াচ্ছে। এই দ্বীপে সত্যি ডাইনোসার আছে কি না দেখার জন্য এখানে চলে আসি আমি। আমার সাথে ডিয়েগো নামে এক গার্ড ছিল। কিন্তু নদীর কাছে ডাইনোসরের হামলার মুখে পড়ি আমরা। ডিয়োগোকে মেরে ফেলে ওরা। আমি কোনভাবে প্রাণ নিয়ে পালাই। সারারাত গাছের ওপর ছিলাম আমি। রাত নামতে ভেলোসিরাপটরগুলোকে দেখতে পাই আমি।

ভেলোসিরাপটর?

ছোট আকৃতির মাংসাশী ডাইনোসর, বলল লেভিন। থেরোপডদের মত শারীরিক গঠন, লম্বা নাক, অত্যন্ত তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি। দুই মিটারের মত লম্বা একেকটা, ওজন নব্বই কিলোর কাছাকাছি। ভীষণ দ্রুতগতি ভেলোসিরাটারদের, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। যদিও শয়তানী বুদ্ধি ভরা মাথায়। সে রাতে আটজনের একটা দল এসেছিল। গাছটার নিচে লাফঝাপ দিচ্ছিল আমাকে ধরার জন্য। সারারাত ওগুলোর লাফঝাপ আর গর্জনে দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। পরদিন সকালে ইনজেনদের ল্যাবরেটরীটা চোখে পড়ে আমার। আমি বিল্ডিংটার মধ্যে ঢুকে অবাক হয়ে দেখি ওটার পাওয়ার স্টেশন এখনো চালু আছে, কম্পিউটার সিস্টেম দিব্যি কাজ করছে আর সবচে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ওদের গোপন ক্যামেরার একটা নেটওয়ার্কও আছে। আমি ক্যামেরাগুলোর চেক করব বলে ঠিক করি। আর ওই সময় আপনারা এসে আমার কাজে বাগড়া দিলেন-

দাঁড়ান দাঁড়ান, বলল এডি। আমরা কিন্তু আপনাকে এখানে উদ্ধার করতে এসেছিলাম।

কিন্তু আমি তো কারো সাহায্য চাইনি, বলল লেভিন।

থর্ন বললেন, কিন্তু ফোনে তো তাই শুনলাম।

তাহলে আপনারা ভুল শুনেছেন, বলল লেভিন। ফোনটা ঠিকমত কাজ করছিল না বলে আমি কিছুক্ষণের জন্য আপসেট হয়ে পড়েছিলাম। ফোনটাও আপনি বড্ড জটিল করে বানিয়েছেন, ডক্টর। যাকগে, আমরা আমাদের কাজ শুরু করতে পারি কি?

থেমে গেল লেভিন। সবাই তার দিকে গরম চোখে তাকাচ্ছে। সে ব্যাপারটাকে পাত্তা না দিয়ে বক্তৃতার ঢঙে বলতে শুরু করল, দেখুন, হতাশ হবার কিছু নেই। এই দ্বীপে অসাধারণ কিছু জিনিস আছে। আমরা ওগুলো খুঁজে বের না করলে অন্যরা এসে এতে নাক গলাবে। কাজেই চলুন এই দ্বীপের অজানা দিকগুলো আবিষ্কার করার চেষ্টা করি।

পনের

সারাহ্ হার্ডিং বসে আছে বসে আছে জেলেদের বড় একটা নৌকায়। নৌকাটা ঢেউয়ের তালে দুলছে। সারাহ্ হার্ডিং যাচ্ছে ইসলা সোরনা দ্বীপে, লেভিনের খোঁজে। দিন কয়েক আগে ডঃ থর্ন তাকে ফোন করে বলেছিলেন লেভিনের সন্ধানে তারা কোস্টারিকার ইসলা সোরনা দ্বীপে যাচ্ছেন। সারাহ্ আসতে চাইলে আসতে পারে। সারাহ্র হাতে ঠিক ঐ সময় অত্যন্ত জরুরী কিছু কাজ থাকায় থর্নদের দলে যোগ দিতে পারেনি। এখন একটু ফ্রি হতেই সটান নাইরোবী থেকে কোস্টারিকার পশ্চিমের খুদে শহরে পুয়ের্তোরো কোতে চলে এসেছে। কিন্তু এসে শোনে যে হেলিকপ্টারটি এর আগে ডঃ থর্নদের ইসলা সোরনা দ্বীপে পৌছে দিয়েছিল সেটি চলে গেছে স্যান ক্রিস্টোবার শহরে। সহসা ওটার ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। উপায় না দেখে জেলে নৌকা ভাড়া করতে চেয়েছে সারাহ্। কিন্তু এয়ারপোর্টের তরুণ এবং একগুঁয়ে স্বভাবের অফিসার রডরিগুয়েজ তাকে হতাশ করে বলেছে আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ বলে কোনো জেলে নৌকাই ঐ দ্বীপে যেতে রাজি নয়।

শেষ চেষ্টা হিসেবে সারাহ্ সাগর তীরে গিয়েছিল, যদি পটিয়ে পাটিয়ে কাউকে রাজি করানো যায়। ওখানে তার পরিচয় হয় লুইস ডজসনের সাথে। লুইস প্রফেসর ব্যাসেলটন এবং তার তরুণ সহকারী হাওয়ার্ড কিংকে নিয়ে ইসলা সোরনা দ্বীপে যাচ্ছে ডাইনোসরের ডিম খুঁজতে। অবশ্যই ডজসন আসল কথা সারাহ্কে ফাঁস করেনি। এমনকি অনুরোধ করা সত্ত্বেও সারাহকে নৌকায় প্রথমে নিতে চায়নি। কিন্তু সারাহ্ও ইসলা সোরনা দ্বীপে যাবে শুনে ডজসন কৌতুহলী হয়ে ওঠে। আর ডঃ রিচার্ড লেভিন সারাহ্র বন্ধু জেনে ডজসনের ভোল পাল্টে যায়। সাথে সাথে সে খাতির জমিয়ে ফেলে সারাহ্র সঙ্গে। বলে স্বচ্ছন্দে সারাহ্ তাদের সঙ্গে ইসলা সোরনা দ্বীপে যেতে পারে। তারপর সারাহ্ উঠে পড়ে নৌকায়।

বড় এই নৌকায় ডজসন একটা র‍্যাংগলার জিপ তুলেছে জঙ্গলে চলাফেরার জন্য। বেশকিছু টিনের ড্রাম সহ কিছু কাঠের খাঁচাও ডজসনকে নৌকায় তুলতে দেখেছে সারাহ্। এগুলো কোন্ কাজে লাগবে জিজ্ঞেস করেনি সে। মাত্র পরিচয় হয়েছে এমন কাউকে এত প্রশ্ন করা যায় না। দীর্ঘ বিমান যাত্রায় ক্লান্ত সারাহ্কে এখন বেশ বমি বমি লাগছে। সী-সিকনেসের বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে ওকে। সামনে দূর দিগন্তে নিচু কালো একটা রেখা দেখা যাচ্ছে। ওটাই ওদের গন্তব্য ইসলা সোরনা দ্বীপ।

মুখ ঘুরিয়ে তাকাল সারাহ্। দেখল ডজসন এবং হাওয়ার্ড কিং রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, গভীর মনোযোগের সাথে কি নিয়ে যেন আলোচনায় ব্যস্ত। কিছু একটা বোঝাতে চেষ্টা করছে সে তার সহকারীকে। ব্যাসেলটনকে ধারে কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তাঁর মত বিখ্যাত একজন মানুষকে মাছধরা নৌকায় দেখে অবাকই হয়েছে সারাহ্। ডজসন নিজেকে পরিচয় দিয়েছে আয়ান ম্যালকমের বন্ধু বলে। কিন্তু স্মৃতি হাতড়েও এই নামটা ম্যালকমের বন্ধুদের তালিকা থেকে উদ্ধার করতে পারেনি সে। অবশ্য ম্যালকমের বহু অদ্ভুত বন্ধু আছে। এও হয়তো তাদের একজন। লোকটা যে কোম্পানীতে কাজ করে, বায়োসিন কর্পোরেশন, জীবনে নাম শোনেনি সারাহ্। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। এখন সারাহ্ ভালোয় ভালোয় দ্বীপে পৌঁছতে পারলেই হল। গত চব্বিশ ঘন্টায় ঘুমোবার সময় সে খুব কমই পেয়েছে। এখন তার দরকার চমৎকার একটি শাওয়ার। স্নান সেরে জম্পেশ একটা ঘুম দিতে পারলেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে সারাহ্র।

হাওয়ার্ড কিং-এর সাথে কথা বলা শেষ করে সারাহ্'র দিকে এগিয়ে এল ডজসন।

সারাহ্ জিজ্ঞেস করল, সব ঠিক আছে তো?

অবশ্যই, হেসে বলল ডজসন।

আপনার বন্ধুকে একটু আপসেট মনে হলো।

ও কিছু না। ও আসলে সাগরযাত্রা পছন্দ করে না। ঢেউয়ের দিকে চেয়ে হাত দুলিয়ে বলল ডজসন।

আশা করছি ঘন্টা খানেকের মধ্যেই তীরে পৌঁছে যাব।

আপনি কি করেন তা তো বললেন না। জানতে চাইল সে।

আমি একজন ইথোলজিস্ট, বলল সারাহ্। আফ্রিকান বড় আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী, বিশেষ করে পূর্ব আফ্রিকার মাংসাশী প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা করাই আমার কাজ।

মাংসাশী?

আমি এখন হায়েনাদের ওপর গবেষণা করছি, বলল সারাহ্। এর আগে সিংহদের নিয়েও কাজ করেছি।

কতদিন হলো?

তা দশ বছর তো হবেই।

ইন্টারেস্টিং! ম্যালকমের সাথে আপনার পরিচয় কিভাবে?

উনি আমার থিসিস পড়তেন, সেই সূত্রে।

আপনি কি সরাসরি আফ্রিকা থেকে এখানে চলে এসেছেন?

হ্যাঁ, তানজানিয়ার সেরোনেরা থেকে।

তানজানিয়ায় কি একা নাকি দলবল নিয়ে কাজ করেন?

না একাই। আমার কাজটা ছেলেখেলা কোনো বিষয় নয়। আর নিশাচর প্রাণীদের নিয়ে আমার কাজ। কাজেই একাই ফিল্ডে যেতে হয়।

আপনার স্বামী কি করেন?

কাঁধ ঝাঁকাল সারাহ্। আমি এখনো বিয়ে করিনি।

সত্যি অবাক হচ্ছি, বলল ডজসন। এত সুন্দরী আপনি।

সময় করে উঠতে পারিনি। দ্রুত বলল সারাহ্। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাতে জিজ্ঞেস করল, দ্বীপের কোথায় নামবেন আপনারা?

ডজসন ঘুরে দাঁড়াল। দ্বীপটা আরো কাছিয়ে এসেছে, পাহাড়ের গায়ে সাদা ফেনা তুলে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। আর মাইল খানেক দূরেও নেই ইসলা সোরনা।

ঐ ওদিকে, হাত তুলে দেখাল ডজসন। ওদিকে কয়েকটা গুহার মত দেখতে পাচ্ছেন? ওখানটায় যাব আমরা। এছাড়া এই দুর্গম দ্বীপে নোঙ্গর করার কোন জায়গা নেই।

গুহার মধ্যে ঢুকে যাবেন? অবাক হল সারাহ্।

আবহাওয়া ভাল থাকলে অসুবিধে হবে না। সারাহ্‌র দিকে ফিরল ডজসন। ভাল কথা, আপনি যাত্রা করেছেন কবে?

ডঃ থর্নের ফোন পাবার প্রায় পরপরই উনি বললেন আয়ানের সাথে রিচার্ডকে খুঁজতে যাচ্ছেন তারা। আমি আসতে চাইলে আসতে পারি।

আপনি কি বললেন?

বললাম ভেবে দেখতে পারি।

ভুরু কোঁকচাল ডজসন। আপনি আসছেন ওদেরকে বলেননি?

না, কারণ আসতে পারব সে রকম নিশ্চয়তা প্রথমে ছিল না। এত কাজ জমা ছিল হাতে ..... তারপর ফ্রি হতেই চলে এসেছি। এমনকি কলিগদেরকেও বলার সুযোগ পাইনি। কথা বলতে বলতে দ্বীপের দিকে তাকাল সারাহ্। বেশ বড় একটা গুহার দিকে এগিয়ে চলেছে নৌকা। ওখানে সাগর ফুঁসে উঠছে দারুণ বিক্ষোভে। বিরাট বিরাট ঢেউ আছড়ে পড়ছে গুহা মুখে, ছিটকে উঠছে সাদা ফেনা। ভয়ঙ্কর লাগছে, মাথা নেড়ে বলল সারাহ্।

ভয়ের কিছু নেই। বলল ডজসন। এর মধ্য থেকেই কিভাবে উতরে যাব দেখবেন।

নৌকাটা ঢেউয়ের ধাক্কায় মোচড় খাচ্ছে, একবার আকাশে উঠে যাচ্ছে আবার তলিয়ে যাচ্ছে নিচে। ভয়ে রেলিং খামচে ধরল সারাহ্। তার পাশে দাঁড়িয়ে হাসল ডজসন, খুব মজার দৃশ্য তাই না, মিস? বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। ভয়ের কিছু নেই, মিস হার্ডিং। আমি এমন কিছু ঘটতে দেব না-

সারাহ্ জানে না ডজসন কিসের ইঙ্গিত করছে, কিন্তু সে জবাব দেয়ার আগেই নৌকার নাকটা হঠাৎ নিচু হয়ে গেল। ছিটকে উঠল ঢেউ, হোঁচট খেল সারাহ্। ডজসন ঝুঁকল তার দিকে, মনে হলো ওকে ধরতে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু একটা ব্যাপার মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল- সারাহ্‌র পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আছড়ে পড়ল নৌকার গায়ে, সারাহ্ টের পেল সে উঠে যাচ্ছে শূন্যে। গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার, খামচে ধরতে চাইল রেলিং। কিন্তু এক ঝলকের জন্য দেখল নৌকার হাল দ্রুত সরে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে, সবুজ সাগর লাফিয়ে এল মুখের কাছে। ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গেল সারাহ্ বিশাল সমুদ্রে।

ষোল

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল সারাহ্ হার্ডিং। মনে হলো শিরিস কাগজের মত কিছু একটা ঘষা খাচ্ছে মুখে। একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা দিল, কানে ভেসে এল হিসহিস আওয়াজ। খুব গরম লাগছে সারাহ্র। টের পাচ্ছে শিরিস কাগজটা মুখ বেয়ে ঘাড়ে চলে এল, তারপর এগোল থুতনির দিকে।

খুব আস্তে চোখের পাতা খুলল সারাহ্। তার দিকে বড় বড় চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে একটা ঘোড়া। ঘোড়াটা জিভ দিয়ে চাটছে ওর শরীর। মাথার ওপর সুনীল আকাশ। সারাহ্ চিৎ হয়ে পড়ে আছে ভেজা মাটিতে।

এক মুহূর্ত মনে করতে পারল না সারাহ্ কোথায় আছে সে। তারপরই সব কথা মনে পড়ে গেল ওর।

নৌকা থেকে ছিটকে পড়ার পর (সারাহ্র মনে হয়েছে ডজসন আসলে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে) ডুবে গিয়েছিল সারাহ্। সাথে সাথে আবার ভেসেও উঠেছিল। প্রকাণ্ড সব ঢেউ ওকে নিয়ে রীতিমত মাতামাতি শুরু করে দিয়েছিল। বাঁচার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল ও। ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অনেক কষ্টে দ্বীপের কাছে চলে আসে সারাহ্। ঢুকে পড়ে একটা গুহার মধ্যে। সাথে সাথে শরীরে প্রবল টান অনুভব করে সে। গুহার তীব্র স্রোত ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। খানিক পর সারাহ্ দেখে স্রোতের টানে সে একটা নদীতে চলে এসেছে। নদীটা বেশ বড়। দু'পাশে ঘন সবুজ বনভূমি। নদীর এক তীরে সে ডজসনের নৌকাটাও বাঁধা দেখেছিল। সারাহ্ অনেক কষ্টে বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে নদীর তীরে উঠে পড়ে। পাড়ের ভেজা মাটিতে তিন আঙুলে জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে সে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। ভাল করে ছাপগুলো লক্ষ করতে যেতেই সারাহ্ টের পায় পায়ের নিচে মাটি প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। পরক্ষণে একটা বিরাট ছায়া ঢেকে দেয় তার শরীর। কানে ভেসে আসে মৃদু ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ। জিনিসটা কি দেখার জন্য মুখ তুলেছিল সারাহ্। হঠাৎ চক্কর দিয়ে ওঠে মাথাটা। প্রবল ক্লান্তিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। হারিয়ে ফেলে জ্ঞান।

সব কথা মনে পড়তে ধড়মড়িয়ে উঠতে গেল সারাহ্। আর তক্ষুনি বুঝতে পারল প্রায় অসচেতনভাবে এতক্ষণ সে প্রাণীটাকে ঘোড়া বলে মনে করেছিল আদৌ ওটা তা নয়। লম্বা মাথা, পিঠে সারি সারি কাঁটা অবিশ্বাস্য মোটা ঘাড় এবং বিশাল শরীর নিয়ে যে আকৃতিটি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাকে চিনতে পেরে আঁতকে উঠল সে। ওহ্ মাই গড!

ওটা একটা প্রাগৈতিহাসিক দানব স্টেগোসারস। অবিশ্বাসে চোখ পিটপিট করল সারাহ্। কোন সন্দেহ নেই ওটা বইতে পড়া সেই ডাইনোসর স্টেগোসারাস।

সারাহ্ চিৎকার করে উঠতে বিশালদেহী জানোয়ারটা নাক দিয়ে ঘোঁত জাতীয় শব্দ করে পিছিয়ে গিয়েছিল। এখন এক দৃষ্টিতে সারাহ্কে কিছুক্ষণ দেখে, সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। নদীতে মুখ ডোবাল স্টেগোসারাস, পানি খাচ্ছে।

ঘড়ির দিকে তাকাল সারাহ্ হার্ডিং। দেড়টা বাজে। মাথার ওপর ঝকঝকে সূর্য আগুন ঝরাচ্ছে। স্টেগোসারাটার ভয়ে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সারাহ্। তার প্রতি ওটার নজর নেই দেখে এবার সে উঠে দাঁড়াল। সাথে সাথে ব্যথায় কাতরে উঠল। শরীরে গিঁটে গিঁটে

ব্যথা। কিন্তু বসে থাকলে চলবে না। ম্যালকম এবং থর্নকে খুঁজে বের করতেই হবে। নগ্ন পায়ে, জঙ্গলের দিকে মুখ করে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল সারাহ্ হার্ডিং।

সতের

জঙ্গলের রাস্তা ধরে শান্তভাবে ছুটে চলেছে ফোর্ড এক্সপ্লোরার। উপত্যকার ওপরে একটা গেম ট্রেইল অনুসরণ করছে ওরা। উপত্যকার নিচে একটা পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটা ঘর আছে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। এই ঘরটাকে আবিষ্কার করেছে রিচার্ড লেভিন। সে এটাকে তার আস্তানা বা হাইড আউট বানিয়েছে। এটাকে আস্তানা বানানোর কারণ, এখান থেকে গোটা উপত্যাকা চমৎকার দেখা যায়। দেখা যায় গোটা উপত্যকা জুড়ে বিভিন্ন ডাইনোসরদের বিস্তৃত বিচরণ। নদীটাও এই হাইড আউট থেকে কাছেই। কাজেই লেভিন রসিয়ে উপভোগ করতে পারে দুর্লভ সব দৃশ্য। বাইনোকিউলার দিয়ে সে দেখে অ্যাপাটোসারের ঝাঁক নদীর তীরে দল মিলে ছোটাছুটি করছে, উত্তরে ট্রাইসেরাটপদের আনাগোনাও তার চোখ এড়ায় না। লেভিনের আস্তানা থেকে খুব ভালভাবে দেখা যায় মাথায় লম্বাচুড়ো নিয়ে ডাকবিল ডাইনোসররা পানি খাচ্ছে। ডাইনোসারদের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণের এমন চমৎকার মওকা এভাবে মিলে যাবে কল্পনাও করেনি রিচার্ড লেভিন। সারাক্ষণ সে তাই তার আস্তানা নিয়ে পড়ে আছে। এক্সপ্লোরার নিয়ে থর্ন এবং ম্যালকম এখন লেভিনের কাছেই যাচ্ছিলেন। থর্ন গাড়ি চালাচ্ছেন, হঠাৎ ম্যালকম বলে উঠল, একটা শব্দ শুনলাম মনে হলো।

কই আমি তো কিছু শুনিনি? বললেন ডঃ থর্ন।

গাড়িটা থামান তো?

গাড়ি থামালেন থর্ন, বন্ধ করে দিলেন ইঞ্জিন। জানালা খুলে বাইরে তাকালেন। প্রচণ্ড গরম। বাতাস নেই এক ফোঁটাও। কান পেতে রইলেন দু'জনে কিছুক্ষণ। শেষে থর্ন বললেন, কই কিছুই তো নেই এখানে।

শ্‌শশ ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল ম্যালকম। মাথা বের করল জানালা দিয়ে। গভীর মনোযোগের সাথে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। একটু পরে সে বলল, মনে হলো গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনলাম। ওদিক থেকে আসছিল। মাথা নাড়লেন থর্ন। উহুঁ, এখানে গাড়ি আসবে কোত্থেকে? এই সময় ক্লিক শব্দে বেজে উঠল রেডিও, ডঃ ম্যালকম? আর্বির গলা।

হ্যাঁ আর্বি।

এই দ্বীপে একজন অতিথির আগমন ঘটেছে।

মানে?

মনিটর চালু করে দেখুন।

থর্ন ড্যাশবোর্ড মনিটরের সুইচ টিপলেন। সিকিউরিটি ক্যামেরা ফুটে উঠল পর্দায়। তারপর পূর্বদিকের ঢালু এবং সরু উপত্যকা দেখা গেল, পাহাড়ের ঢাল, গাছপালা ছাড়া আর কিছু নেই টিভি পর্দায়।

কি দেখেছ, আর্বি?

দেখতে থাকুন।

পাতার ফাঁক দিয়ে খাকি পোশাকের একটা ঝিলিক দেখলেন ডঃ থর্ন। তারপর আরেকবার। তিনি বুঝলেন ছোটখাটো চেহারার একজন মানুষ জঙ্গলের ঢাল বেয়ে আসছে তাদের দিকে। বুঝতে পেরেছেন কে? হাসছে আয়ান ম্যালকম।

অবশ্যই, বললেন থর্ন। আমাদের সারাহ্ হার্ডিং।

আঠারো

শাওয়ারের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কেলী কার্টিস। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে বিছানার ওপর রাখা কাদামাখা শর্টস আর খাকি শর্ট স্লিভ শার্টের দিকে।

সারাহ্ হার্ডিংয়ের আসল পোশাক, ভাবল কেলী। হাত বাড়িয়ে ছুঁলো ওগুলো। রং চটে গেছে, কাপড়ের দু'এক জায়গায় সুতো বেরিয়ে পড়েছে। পকেটের কাছে লালচে দাগ, রক্তের দাগ কিনা কে জানে। কেলী শুনেছে ম্যালকমরা সারাহ্কে উদ্ধার করার আগে সে একদল মাংসাশী ডাইনোসরের কবলে পড়ে গিয়েছিল। ডাইনোসারগুলো নিজেদের মধ্যে মারামারিতে ব্যস্ত ছিল বলে রক্ষা। নইলে তার প্রিয় সারাহ্ হার্ডিংয়ের হাড় ক'খানাও--এতক্ষণে লোপাট হয়ে যেত।

কেলী? বাথরুম থেকে ডাকল সারাহ্।

জ্বী? জবাব দিতে গিয়ে কেঁপে গেল কেলীর কণ্ঠ।

শ্যাম্পু আছে?

দেখছি ডঃ হার্ডিং, বলল কেলী। কিন্তু খোঁজাখুঁজি করেও কোন শ্যাম্পু পেল না।

শোনো, বলল সারাহ্। শ্যাম্পু না পেলেও ক্ষতি নেই। ডিশ ধোয়ার সাবান থাকলে দাও। ওতেও চলবে।

সিঙ্কের কাছে সবুজ রঙের বোতলটা তুলে নিল হাতে কেলী। পর্দার ফাঁক দিয়ে ওটা সারাহ্র হাতে ধরিয়ে দিল। এই নিন, ডঃ হার্ডিং।

ধন্যবাদ, কেলী। আর শোনো আমাকে সারাহ্ বলে ডেকো।

আচ্ছা, ডঃ হার্ডিং।

সারাহ্।

আচ্ছা সারাহ্।

গোসল সেরে ফ্রেশ হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সারাহ্ হার্ডিং। খাটো চুলের মাঝে আঙুল চালিয়ে দিল। এখন বেশ ভাল লাগছে কেলী। ডক্টরের এই ট্রেলারটার সত্যি তুলনা নেই। চলোতো গিয়ে দেখি ওরা কি করছেন।

সারাহ্ এবং কেলী গিয়ে দেখল সবাই মনিটর ঘিরে বসে আছে। প্রত্যেকের চেহারায় উৎকণ্ঠার ছাপ।

কি হয়েছে? জানতে চাইল সারাহ।

সেই শয়তানের বাচ্চা ডজসনটা, বলল ম্যালকম। সব ভণ্ডুল করে দিতে এসেছে।

মনিটরের দিকে তাকাল সারাহ্। র‍্যাংলার জিপটাকে দেখেই চিনতে পারল।

ওরা এই মুহূর্তে আছে কোথায়? আর্বিকে জিজ্ঞেস করল ম্যালকম।

পূর্ব উপত্যকার কাছাকাছি, বলল আর্বি। যেখানে ডঃ লেভিনকে আমরা খুঁজে পেয়েছি।

তার মানে, ডাইনোসরদের আস্তানার কাছে, মন্তব্য করল ম্যালকম। ওদেরকে ঠেকাতেই হবে। নইলে মস্ত সর্বনাশ হয়ে যাবে।

উনিশ

লাল রঙের র‍্যাংগলার জিপ গাড়িটা আস্তে থেমে পড়ল। ঠিক সামনে ঘন জঙ্গল দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও সূর্যের আলোতে ওটার পেছনের ফাঁকা জায়গাটা পরিষ্কার দেখতে পেল হাওয়ার্ড কিং।

লুইস ডজসনের বিশ্বস্ত সহকারী হাওয়ার্ড কিং। বয়সে যুবক। পরপর দুটো রিসার্চে দু'বারই ভরাডুবি হবার পরে কিংয়ের আর্থিক এবং মানসিক অবস্থা যখন শোচনীয় এমন সময় বায়োসিন কোম্পানীর তরফ থেকে লুইস ডজসন এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করে। তাকে অত্যন্ত উঁচু বেতনের চাকরিও দিয়ে দেয় ডজসন। সেই থেকে লুইস ডজসনের সাথে আছে কিং।

কিং স্বাধীনচেতা এবং স্পষ্টবাদী। সারাহ্ হার্ডিংকে তার বস সাগরে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, স্পষ্ট দেখেছে সে। যদিও ডজসন ব্যাপারটাকে স্রেফ দুর্ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইছে। আর জর্জ ব্যাসেলটনও ডজসনকে সমর্থন করছেন দেখে কিং ওটা নিয়ে আর কথা বাড়াতে সাহস পায়নি। ওরা এই দ্বীপে আসার পর একটা গেম ট্রেইল ধরে সরাসরি হাজির হয়েছে মাইয়াসার নামের এক প্রজাতির ডাইনোসরদের আস্তানায়। ডজসনের কাছে গোপন একটা ম্যাপ আছে, কিভাবে সংগ্রহ করেছে, সেই জানে। কিংকে ডজসন বলেছে ম্যাপে খুব ভালভাবে আঁকা আছে ইসলা সোরনা দ্বীপের কোন্ কোন্ জায়গায় ডাইনোসরের ডিম পাওয়া যাবে।

সেই দুষ্প্রাপ্য ডিম সংগ্রহ করতে প্রথমেই তারা হানা দেয় হাঁসের মত চেহারার তৃণভোজী মাইয়াসার ডাইনোসারদের আস্তানায়।

লুইস ডজসন ব্লাকবক্সের মত দেখতে একটা যন্ত্র নিয়ে এসেছে। আসলে এটা একটা সাউন্ড মেসিন। এমন ভয়াবহ এবং বিকট আওয়াজ ছাড়ে যন্ত্রটা স্নায়ুতন্ত্রী ছিঁড়ে যেতে চায়। এই যন্ত্র চালিয়ে মাইয়াসারদের ভাগিয়ে দিয়েছে ডজসন, তারপর ওদের ডিম চুরি করে নিয়ে এসেছে।

প্রথম নির্ঝঞ্ঝাট অভিযানের সাফল্যের পরে খুশিতে বাগ বাগ ডজসন এসেছে আরেক প্রজাতির ডাইনোসরদের আস্তানায়। তার বিশ্বাস সাউন্ড মেসিনের ভয় দেখিয়ে এখান থেকেও বীরের মত ডিম নিয়ে কেটে পড়া যাবে।

ডজসন গাড়ির সিটে বসে আছে চুপচাপ। কিং ঘুরল তার দিকে, কি যেন বলবে, কিন্তু হাত তুলল ডজসন, কথা বলতে নিষেধ করল তাকে। গভীর মনোযোগের সাথে কিছু একটা শুনছে সে।

একটু পরে স্পষ্ট হলো ওটা– নীচু স্বরের গোঁ গোঁ একটা আওয়াজ, প্রায় বেড়ালের

গড়গড়ানির মত। শব্দটা আসছে সামনের জঙ্গল থেকে। এমন অদ্ভুত শব্দ জীবনে শোনেনি ডজসন, একই সাথে একটা দুলুনী টের পেল সে, স্টিয়ারিং কলামে ঢোকানো চাবির গোছা টিংটিং করে বেজে উঠল। ডজসনের মনে হলো ওটা যেন চলতে শুরু করেছে।

খুব বড় কোন প্রাণী হাঁটছে।

তার পাশে বসা কিং অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। হাঁ হয়ে আছে মুখ। ডজসন এক নজর তাকাল প্রফেসর ব্যাসেলটনের দিকে। তিনিও শব্দটা শুনছেন, এত জোরে সিট চেপে ধরে আছেন যে আঙুলের ডগাগুলো সাদা হয়ে গেছে।

সামনের ঝোপে একটা ছায়া দেখা গেল। বিশ ফুটের মত উঁচু, চল্লিশ ফুট লম্বা, ছায়া দেখে অনুমান করা যায়। পেছনের পায়ে ভর করে হাঁটছে ওটা। শরীরটা প্রকাণ্ড, খাটো ঘাড়, মাথাটা মস্ত বড়।

ওটা একটা টাইরানোসর।

ডজসনের বুকে হাতুড়ি পেটা শুরু হল। একবার ভাবল ওটাকে ছেড়ে অন্য ডাইনোসরের আস্তানায় যাই। কিন্তু সাউন্ড মেশিনের ওপর তার প্রবল আস্থা। তাই বলল, বক্সটা আমাকে দাও। এটা দিয়েই আগের বারের মত কাজ সারবো।

ব্যাসেলটন গতবারের মত এবারও ডজসনের হাতে তুলে দিলেন ব্লাকবক্স।

ডজসন জানতে চাইল, ব্যাটারী চার্জ করা আছে?

মাথা দোলাল কিং, জ্বী।

বেশ, বলল ডজসন। কাজ শুরু করা যাক। ঠিক আগের মত। আমি প্রথমে যাব, তোমরা আমাকে অনুসরণ করে ডিম নিয়ে এসে গাড়িতে রাখবে। ঠিক আছে?।

জর্জ ব্যাসেলটন বেশ উৎসাহ নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলো। কিন্তু টাইরানোসারের আস্তানার কাছে আসতে টের পেলেন হাঁটু কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে তাঁর।

ডজসন প্রফেসরের সামনে, বন্দুকের মত ব্লাকবক্সটা ধরে বীরদর্পে এগোচ্ছে। কিং-এর দিকে তাকালেন ব্যাসেলটন। চেহারা বিবর্ণ হয়ে আছে ওর, ঘামে জবজবে মুখ।

ডজসন ঝোপ পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় ঢোকার আগ মুহূর্তে ইশারা করল কিং এবং ব্যাসেলটনকে। তারপর ঢুকে পড়ল ডাইনোসরের আস্তানায়।

ডাইনোসর একটা নয়, দুটো! মাটির একটা টিলার দু'পাশে বসে আছে দু'জন। পরিণত, বিশ ফুট উঁচু, গাঢ় লাল চোখো, বিকট চোয়ালের দুই দানব।

মাইয়াসারদের মতই ভোঁতা দৃষ্টিতে ডজসনকে দেখল ওরা। অনুপ্রবেশকারীদের দেখে অবাক হয়েছে মনে হলো। হঠাৎ দানব দুটো রাগে গর্জন করে উঠল একসাথে। আকাশ ফাটানো অপার্থিব এবং ভয়ংকর চিৎকার।

ডজসন বাক্সটা ডাইনোসরদের দিকে তাক করে ধরল। পর মুহূর্তে বাতাস চিরে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ম একটা চিৎকার শোনা গেল। শব্দটা একনাগাড়ে হতেই থাকল।

আরো জোরে গর্জে উঠল টাইরানোসার দুটো। নামিয়ে আনল মাথা, ঘাড়টা বাগিয়ে ধরে, মুখ হাঁ করে হামলার প্রস্তুতি নিল ওরা। মাটির টিলা ঘুরে ডজসনের দিকে এগোতে শুরু করল অতিকায় দুই দানব। তাদের পায়ের চাপে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল মাটিতে।

সর্বনাশ, আর্তনাদ করে উঠল হাওয়ার্ড কিং। কিন্তু ডজসনের চেহারায় কোন ভাবান্তর

নেই। সে ডায়ালে মোচড় দিতে শুরু করল। হাত দিয়ে কান চেপে ধরলেন ব্যাসেলটন। তীক্ষ্ণ আওয়াজটা আরো চড়া হতে শুরু করেছে, কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়। প্রতিক্রিয়াটা হলো তৎক্ষণাৎ। দড়াম করে ঘুষি খেয়েছে যেন, ঝট করে পিছু হঠল টাইরানোসার দুটো। পিটপিট করল চোখ। আবার গর্জন শোনা গেল ওদের। তবে আগের মত আর জোর নেই গলায়। মাটির টিলার মাঝখান থেকে বিকট চিৎকার ভেসে এল এই সময়।

শূন্যে সাউন্ড মেশিনটা তাগ করে রেখে সামনে পা বাড়াল ডজসন। ঘরের দিকে চোখ রেখে পিছু হঠতে শুরু করল টাইরানোসার, তারপর তাকাল ডজসনের দিকে। ক্রমাগত মাথা দোলাচ্ছে ওরা যেন মুক্তি পেতে চাইছে গগণবিদারী শব্দটা থেকে। সাউন্ড মেশিনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল, রীতিমত ভাইব্রেশন শুরু হল বাতাসে।

ডজসন ডাইনোসরদের মাটির ঘর বেয়ে উঠতে শুরু করল। হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়ে নিজেদের সামলে নিয়ে তাকে অনুসরণ করল কিং এবং ব্যাসেলটন। ব্যাসেলটন একটা ঘরে সাদা রঙের চারটে ডিম খুঁজে পেলেন, টার্কি আকৃতির দুটো ডাইনোসরের বাচ্চাও আছে আস্তানায়।

দুই টাইরানোসার পিছু হঠতে হঠতে ফাঁকা জায়গাটার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছে। মাইয়াসারদের মত তারা শব্দের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে প্রস্রাব করে দিল। পা টলমল করছে দুটোরই, কিন্তু কাছে আসার সাহস পেল না কেউ।

ব্লাকবক্সের কান ফাটানো শব্দকে ছাপিয়ে ডজসনের চিৎকার শোনা গেল 'ডিমগুলো তুলে নাও'। প্রায় হতভম্বের মত হাতের কাছের ডিমটার দিকে হোঁচট খেতে খেতে এগোল কিং। ডিম তুলতে গিয়ে হাত ফস্কে পড়ে গেল; তবে মাটিতে পড়ার আগেই ওটা ধরে ফেলল আবার। ফেরার সময় একটা ডাইনোসরের বাচ্চার পা মাড়িয়ে দিল সে অসাবধানে। ভয়ে এবং যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল বাচ্চা।

বাচ্চার চিৎকার শুনে এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার বাবা-মা, চেষ্টা করল এগোতে। কিং কোনমতে টিলা বেয়ে নেমে পড়ল মাটিতে। পড়িমরি করে দৌড় দিল জঙ্গল লক্ষ্য করে। ব্যাসেলটন তাকিয়ে থাকলেন ওর দিকে।

জর্জ! টাইরানোসারদের দিকে বাক্সটা ধরে রেখে চিৎকার করে বলল ডজসন। বাকি ডিমগুলোও নিয়ে নিন।

বিকট চেহারার ডাইনোসরগুলোর দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন প্রফেসর। তাঁর মনে হলো দ্বিতীয়বার নিশ্চয়ই ওরা ওদের ঘরে আর কাউকে ঢুকতে দেবে না। কিং-এর ভাগ্য ভাল সে কেটে পড়তে পেরেছে, কিন্তু ব্যাসেলটনের ভাগ্য ভাল নাও হতে পারে।

জর্জ শিগগির।

ব্যাসেলটন আমতা আমতা করলেন, আ-আমি পারব না।

গোল্লায় যান আপনি। গর্জে উঠল ডজসন। বাক্সটাকে উঁচিয়ে ধরে সে নিজেই ডাইনোসারের ঘরের দিকে পা বাড়াল। আর তক্ষুণি ঘটল ঘটনাটা। ডজসনের পা লেগে বক্স থেকে ছিটকে গেল ব্যাটারী প্লাগ।

সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল শব্দ।

অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল ফাঁকা জায়গাটার মাঝে।

ফুঙিয়ে উঠলেন ব্যাসেলটন।

শেষবারের মত মাথা ঝাঁকাল টাইরানোসাররা, তারপর গর্জন করে উঠল।

ব্যাসেলটন দেখলেন ডজসন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়েছে। স্থির হয়ে গেলেন ব্যাসেলটন নিজেও। তারপর কাঁপুনি শুরু হল তাঁর শরীরে। বিস্ফোরিত হয়ে উঠল চোখ। নড়তে ভুলে গেছেন যেন তিনি।

উঠোনের শেষপ্রান্তে নড়ে উঠল দুই প্রাগৈতিহাসিক দানব। তারপর জর্জ ব্যাসেলটনকে লক্ষ্য করে ছুটে আসতে লাগল তীব্র বেগে।

বিশ

ডজসন দেখল ডাইনোসর দুটোর একটা কিছু দূর ছুটে এসে হঠাৎ নিজেদের বাড়ির কাছে ফিরে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে একের পর এক গর্জন ছাড়তে লাগল। অন্যটা ওদের দু'জনকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে লাগল।

ডজসনের কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যাসেলটন। তবুও তার দিকে ফিরে চাইবার সাহস হলো না ডজসনের। ব্যাসেলটন সম্ভবত কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছেন তাই দৌড়াতে পারছেন না, ভাবল ডজসন। আর দৌড় দিলে সাথে সাথে মারা পড়বেন তিনি। যদি ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন তা হলে হয়তো কিছুই ঘটবে না।

আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে আছে ডজসন, বেল্টের সাথে বাঁধা বক্সের দিকে খুব সাবধানে ডানহাত বাড়ালো। ধীরে, খুবই ধীরে ছেঁড়া পাওয়ার কর্ডটা ধরে টান দিল সে। তার যেখানটায় ছিঁড়ে গেছে সে জায়গায়টায় প্লাগ ঢোকাবে সে এখন, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। চালু হয়ে যাবে ব্লাকবক্স।

ডাইনোসারটা আরো কাছে এসে পড়েছে ডজসনের। মাংসাশী প্রাণীটার নিশ্বাসে বড্ড দুর্গন্ধ। গর্জে উঠল দানব, গরম বাতাস লাগল ডজসনের গায়ে। ওটা এখন ব্যাসেলটনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ডজসন খুব সাবধানে মাথা ঘোরাল।

এখনো পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ব্যাসেলটন। আরো কাছিয়ে এল ডাইনোসর। মাথা নামিয়ে আনল, ঘোঁত করে নাক দিয়ে বিদঘুঁটে একটা শব্দ করল। আবার মাথা তুলল। আকাশ ফাটিয়ে বিকট চিৎকার দিল। তারপরও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই থাকলেন ব্যাসেলটন। ঝুঁকল টাইরানোসার, চোয়াল জোড়া একবার খুলল, আবার বন্ধ হলো। ব্যাসেলটন বিস্ফোরিত চোখে দানবটার দিকে চেয়ে আছেন, চোখের পলক ফেলতেও ভুলে গেছেন। তার গায়ের গন্ধ শুঁকল টাইরানোসার, ফুলে উঠল নাকের পাটা।

হঠাৎ নাক দিয়ে ব্যাসেলটনকে ধাক্কা দিল টাইরানোসার। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলেন প্রফেসর। হাতির পায়ের চেয়েও মোটা বিরাট একটা পা তুলল প্রাগৈতিহাসিক দানব, মাটির সাথে পিষে ফেলল ব্যাসেলটনকে। তীব্র যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলেন প্রফেসর। দেখলেন ধারাল দাঁতের সারিসহ হাঁ করা প্রকাণ্ড একজোড়া চোয়াল এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। টাইরানোসার কামড়ে ধরল প্রফেসরকে। মাংস ছেঁড়ার বিশ্রী শব্দ হলো, ডজসন দেখল ব্যাসেলটনের

রক্তাক্ত একটা হাত ঝুলছে ওটার মুখে। সূর্যের আলো পড়ে প্রফেসরের কাটা হাতের সাথে বাঁধা ঘড়ির কাঁচ ঝিকিয়ে উঠল টাইরানোসারদের চোখের ঠিক নিচে।

চিৎকার করতেই থাকলেন প্রফেসর। একের পর এক রোমহর্ষক চিৎকার। তাঁর চিৎকার শুনে সম্বিৎ ফিরে পেল ডজসন। ঘুরে দাঁড়াল সে। দৌড়াতে শুরু করল।

এমন দৌড় দৌড়াল ডজসন পৃথিবীর সেরা স্প্রিন্টারও ওর গতির কাছে কিছু নয়। বেল্ট থেকে ব্যাটারী ট্যাটারী ছিটকে কোথায় পড়ে গেল, হুঁশও থাকল না ওর। জিপের কাছে এসে ডজসন দেখল কিং বিবর্ণ চেহারা নিয়ে বসে আছে জিপে।

লাফিয়ে গাড়িতে উঠল ডজসন, স্টার্ট দিল। গর্জন করে উঠল টাইরানোসারও।

ব্যাসেলটন কোথায়? জিজ্ঞেস করল কিং।

ওর খবর হয়ে গেছে, বলল ডজসন।

মানে?

মানে পালাতে পারেনি। চিৎকার করে বলল ডজসন। লাফাতে লাফাতে চলতে শুরু করল গাড়ি, পেছনে টাইরানোসারের গর্জন শোনা গেল।

কিং ডিমটা হাতে ধরে রেখে পেছনের রাস্তায় তাকাল। এটা ফেলে দিই? বলল সে।

খবরদার! চোখ পাকাল ডজসন।

কিং জানালাটার কাঁচ নামাল। মনে হয় ও ডিমটা ফেরত পেতে চাইছে।

না! বলল ডজসন। 'না!' গাড়ি চালাতে চালাতে হাত বাড়াল সে, বাধা দিল হাওয়ার্ড কিংকে। ট্রেইলটা সরু, মাঝে মাঝেই গভীর গর্ত। রীতিমত ঝাঁকি খেতে শুরু করল জিপ।

হঠাৎ বিস্ফোরিত হল সামনের জঙ্গল, যমদূতের মত রাস্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটা টাইরানোসার। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকল ওটা। ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করছে।

খোদা! আর্তনাদ করে উঠল ডজসন, ব্রেক কষল। পেছল রাস্তায় আচমকা থেমে গেল গাড়ি।

গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসতে শুরু করল টাইরানোসার।

গাড়ি ঘোরান! হাউমাউ করে উঠল কিং। গাড়ি ঘোরান!

কিন্তু গাড়ি ঘোরাল না ডজসন, সে ট্রেইল ধরে উল্টোদিকে চলতে শুরু করল। রাস্তাটা সরু এবং বিপজ্জনক, কিন্তু গ্রাহ্য করল না ডজসন। পুরো স্পীডে চালাতে লাগল গাড়ি।

আপনি পাগল হয়ে গেছেন। গলা ফাটাল কিং। মরব তো সবাই।

চুপ, ঘেউ ঘেউ করে উঠল ডজসন। আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে গভীর মনোযোগে গাড়ির চালাতে থাকল সে। ওর শুধু মনে হচ্ছে মত দ্রুতই গাড়ি চালাক না কেন টাইরানোসারের সাথে দৌড়ে তারা পারবে না।

না!। চিৎকার দিল কিং।

পেছনে, ডজসন দেখল দ্বিতীয় টাইরানোসার হুড়মুড় করে ছুটে আসছে। সামনের দিক তাকিয়ে ওর আত্মা উড়ে গেল। প্রথম টাইরানোসারটা ঠিক সামনেই। ফাঁদে পড়েছে ওরা।

আতঙ্কিত ডজসন বনবন করে হুইল ঘোরাল, রাস্তা ছেড়ে লাফ মেরে গাড়ি গিয়ে ঢুকল পাশের জঙ্গলে, প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দ হলো। গাড়ির পেছনের অংশ পিছলে যেতে শুরু করল। ডজসন বুঝতে পারল পেছনের চাকাগুলো পাহাড়ের কোনায় আটকে গেছে, ঝুলছে। হুইল

নিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করল ডজসন। কিন্তু কোনো কাজ হল না। শূন্যে বনবন করে ঘুরল চাকা। আস্তে আস্তে পেছন দিকে উল্টে যেতে শুরু করল জিপ, ঘন ঝোপের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, এত গহীন অরণ্য ডজসন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার পাশে কিং ফোঁপাতে শুরু করেছে। খুব কাছে থেকে ভেসে এল টাইরানোসারের গর্জন।

ডজসন ঝট করে দরজা খুলল, লাফ দিল শূন্যে। ঝোপের ওপর গিয়ে পড়ল সে, প্রচণ্ড বাড়ি খেল একটা গাছের গোড়ার সাথে, ডিগবাজি খেতে খেতে নিচে পড়ে যেতে শুরু করল ডজসন। হঠাৎ কপালে তীব্র ব্যথা অনুভব করল সে, চোখের সামনে ফুটে উঠল অসংখ্য তারার ঝলকানি, কালো, গাঢ় একটা পর্দা ঢেকে দিল ওর সমস্ত চেতনা। জ্ঞান হারাল ডজসন।

একুশ

গুনগুন একটা শব্দ হচ্ছে, যেন দূর থেকে ভেসে আসছে মৌমাছির গুঞ্জন। অস্পষ্টভাবে শব্দটা কানে ঢুকছে হাওয়ার্ড কিং এর। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে সে। চোখ মেলল ও, প্রথমে নজরে এল গাড়ির উইন্ডশিল্ড, তারপর ডালপালাসহ গাছ।

গুনগুন শব্দটা আরো জোরালো হয়ে উঠছে। কোথায় আছে বুঝতে পারল না কিং। এখানে কি করে এল, কি হয়েছে কিছুই মনে করতে পারছে না সে। কাঁধ এবং নিতম্ব ব্যথা করছে। দপদপ করছে কপাল। স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে ব্যথাটা আরো চাগিয়ে উঠল। যদ্দুর মনে পড়ে রাস্তায় টাইরানোসারটার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল সে। তারপর ডজসন পেছন ফিরে তাকাল এবং–

মাথা ঘোরাল কিং সঙ্গে সঙ্গে গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তনাদ, ঘাড় থেকে খুলি পর্যন্ত ব্যথার তীব্র একটা ধাক্কা ওকে প্রায় অবশ করে দিল। দম বন্ধ হয়ে এল কিং-এর, মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। খানিক পরে আবার আস্তে আস্তে খুলল।

গাড়িতে নেই ডজসন। ড্রাইভারের দিকের দরজা খোলা। ইগনিশন কি জোড়া আছে আগের জায়গায়। চলে গেছে ডজসন।

স্টিয়ারিং হুইলের মাথায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত লেগে আছে। ব্লাক বক্সটা মেঝেতে গিয়ারশিফটের ওপর। দূর থেকে আবার গুনগুন শব্দটা ভেসে এল, দানব মৌমাছি যেন গুঞ্জন করছে। যান্ত্রিক শব্দ এটা, বুঝতে পারল হাওয়ার্ড কিং। কোনো মেসিন থেকে শব্দটা আসছে।

নৌকার কথা মনে পড়ে গেল তার। নদীতে নৌকাটা কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? এখন কটা বাজে? ঘড়ির দিকে তাকাল সে। ঘড়ির কাঁচ গুঁড়ো হয়ে গেছে, ১.৫৪ মিনিটে স্থির হয়ে আছে কাঁটা দুটো।

আবার গুনগুন শব্দটা শোনা গেল। কাছিয়ে আসছে। অনেক কসরত করে সিট থেকে শরীরটাকে টেনে তুলল হাওয়ার্ড কিং, ঝুঁকল ড্যাশবোর্ডের দিকে। শিরদাঁড়ায় বিদ্যুতের চাবুক খেল সে। দাঁতে দাঁতে চেপে ব্যথাটা হজম করল কিং।

আমি ঠিক আছি, ভাবল সে। অন্তত বেঁচে তো আছি।

সূর্যের দিকে তাকিয়ে কিং অনুমান করল বিকেল হয়ে এসেছে। নৌকা ছাড়বে কখন?

চারটায়? পাঁচটায়? সঠিক সময়টা মনে করতে পারল না ও। ডজসন বড়াই করে বলেছিল ডাইনোসরের ডিম সংগ্রহ করতে তাদের চারঘন্টার বেশি কিছুতেই লাগবে না। কিন্তু কিং নিশ্চিত সন্ধ্যা পর্যন্ত নৌকাঅলা তাদের জন্য অপেক্ষা করবে না। চলে যাবে দ্বীপ ছেড়ে। তার আগেই হাওয়ার্ড কিংকে নৌকায় গিয়ে উঠতেই হবে। ব্যথার তীব্রতা সহ্য করে ড্রাইভারের সিটে এসে বসল কিং। গভীর একটা দম নিল। তারপর খোলা দরজা দিয়ে তাকাল বাইরে।

গাছের ডালের সাথে বেঁধে শূন্যে ঝুলে আছে গাড়িটা। পাহাড়ের ধারে ঢালু জঙ্গলে চোখে পড়ল কিং-এর, ঠিক তার নিচে। গাছের ঘন চাঁদোয়া অন্ধকার করে রেখেছে জায়গাটা। নিচের দিকে তাকাতেই মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। কমপক্ষে ত্রিশ ফুট নিচে মাটি। ছিন্নভিন্ন সবুজ ঝোপঝাড় এবং কিছু কালো পাথর দেখতে পেল কিং। নিচের দৃশ্যটা আরো ভাল করে দেখার জন্য শরীর মুচড়ে তাকাল সে।

আর তক্ষুণি ওকে দেখতে পেল।

চিৎ হয়ে আছে ডজসন, মাথাটা নিচের দিকে পড়ে আছে পাহাড়ের ঢালে। শরীরটা 'দুদ' হয়ে আছে, হাত পা ছড়িয়ে আছে অদ্ভুতভাবে। নড়াচড়া করছে না ডজসন। পাহাড়ের পাশে ঘন ঝোপের কারণে ওকে ভালমত দেখা যাচ্ছে না। তবে, অনুমান করল কিং, মারা গেছে ডজসন।

হঠাৎ গুনগুন শব্দটা প্রকট হয়ে উঠল, বাড়তেই থাকল, কিং সামনে তাকাতে ঝোপের আড়াল থেকে গাড়িটাকে দেখা গেল। দশগজ দূরেও নেই ওটা।

তারপরই চলে গেল গাড়িটা। শব্দ শুনে কিং বুঝতে পারল ওটা একটা ইলেকট্রিক কার। নিশ্চয় ম্যালকমের।

হাওয়ার্ড কিং-এর অনুমান নির্ভুল। ম্যালকমরা পূবের উপত্যকায় কিংদের দেখে ওখানে গিয়েছিল। তার আগেই টাইরানোসারের তাড়া খেয়ে ভেগেছে ডজসন এবং কিং। আস্তানা থেকে ডিম সরানো হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হয়নি ম্যালকমদের। কিন্তু ডজসন এবং তার লোকদের বিপদের সম্ভাব্যতা টের পেয়ে স্রেফ মানবিক কারণে ওরা ওদেরকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটুর জন্য মিস করে ফেলল কিংকে।

দ্বীপে আরো লোকজন আছে এই ভাবনাটা শক্তি যোগাল কিং-এর শরীরে। সে গাড়িতে স্টার্ট দিল। গোঁ গোঁ করে উঠল ইঞ্জিন।

গিয়ার দিল কিং, তারপর আলগোছে পা চেপে ধরল অ্যাক্সেলেটারে।

পেছনের চাকা সজোরে ঘুরতে শুরু করল। সামনের চাকাও চালু করল কিং। সাথে সাথে বাঘের মত লাফ দিল গাড়ি, ডালপালা ভেঙে গিয়ে পড়ল রাস্তায়।

রাস্তার লোকেশন মনে পড়ল কিং-এর। ডানদিকে ডাইনোসরদের আস্তানা। সে বাঁদিকে গাড়ি ছোটাল।

গাড়ি চালাতে চালাতে কিং মনে করার চেষ্টা করল কিভাবে নদী তীরে পৌছানো যায়। পাহাড়ের মাথায় ইংরেজী ওয়াই অক্ষরের মত একটা দ্বিমুখী রাস্তা আছে। কিং ঠিক করল সে ঐ রাস্তায় যাবে, পাহাড়ের মাথায় উঠে দ্বীপটা আগে ভাল করে দেখবে। কারণ এছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। দেরী হবার আগেই এ দ্বীপ ছেড়ে কেটে পড়তে হবে তাকে।

বাইশ

এক্সপ্লোরার পাহাড়ের মাথায় চলে এল, থর্ন খাড়া রাস্তা ধরে গাড়ি ছোটালেন। রাস্তাটা চূড়োটাকে ভাগ করে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সামনে। এখান থেকে গোটা দ্বীপটাকে পরিষ্কার দেখা যায়। ওরা এমন একটা জায়গায় চলে এলেন যেখান থেকে গোটা উপত্যকা চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠল। এখান থেকে বাঁদিকে তাকালে দেখা যায় রিচার্ড লেভিনের আস্তানা, সাথে ট্রেলার দুটো আর ডানদিকে ল্যাবরেটরী কমপ্লেক্স, তার পেছনে ওয়ার্কার কমপ্লেক্স।

ডজসনের পাত্তাও তো দেখতে পাচ্ছি না, অসন্তুষ্ট সুরে বলল ম্যালকম। কোথায় যেতে পারে লোকটা?

থর্ন রেডিওর বোতামে চাপ দিলেন। আর্বি? ওদের দেখতে পাচ্ছ তুমি?

না। তবে .... ইতস্তত করছে সে

তবে কি?

আপনি আমাদের এখানে চলে আসুন। একটা মজার জিনিস দেখতে পাবেন।

কি জিনিস? জানতে চাইলেন থর্ন

এডি, বলল আর্বি। এইমাত্র ডাইনোসারদের আস্তানা থেকে ফিরছে। সাথে ডাইনোসারের একটা বাচ্চাও নিয়ে এসেছে।

তেইশ

দ্বি-মুখী রাস্তায় এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল হাওয়ার্ড কিং। বাঁদিকে মোড় নিল। এসে পড়ল ধুলো মোড়া, চওড়া একটা রাস্তায়। দেখেই চিনে ফেলল কিং। এটা সেই রিজ রোড, এ পথ ধরে গেলে সরাসরি নৌকায় পৌছানো যাবে। বাম দিকে তাকাতে পূর্ব উপত্যকার পুরো অবয়ব পরিষ্কার ফুটে উঠল চোখের সামনে। নৌকাটাও আছে। আনন্দে লাফিয়ে উঠল কিং, অ্যাক্সেলেটারেটর দাবিয়ে ধরল পুরো দমে। স্বর্গের শান্তি নেমে এল শরীর জুড়ে। নৌকায় স্প্যানিশ জেলেদেরকেও দেখা যাচ্ছে, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ঝড়বৃষ্টি ভয়েই হয়তো ওরা নৌকা ছাড়েনি। হতে পারে ডজসনের জন্য অপেক্ষা করছে।

বেশ, ভাবল কিং, অল্পক্ষণের মধ্যে ওখানে গিয়ে পৌছুতে পারবে সে। গাড়ি চালাতে চালাতে বুঝতে পারল সে কোথায় আছে। রিজ রোডটা খাড়া, পাথুরে দ্বীপটার আগ্নেয়গিরির একটা চূড়ো অনুসরণ করে সোজা চলে গেছে উঁচুতে। এদিকে ঘন ঝোপ নেই বললেই চলে। মোড় নিতে সম্পূর্ণ দ্বীপটা দেখতে পেল হাওয়ার্ড কিং। পূবে খাদের পরে নদী, তীরে নোঙর করে আছে নৌকা। পশ্চিমে ল্যাবরেটরী, ওখানে ফাঁকা জায়গাটার এক কোণে ম্যালকমের ট্রেলার জোড়া পার্ক করা।

ম্যালকম এখানে কি করছে তা জানার সুযোগ ওদের কোনদিনই হবে না, ভাবল কিং। অবশ্য এখন ওসব ব্যাপারে তার কোন আগ্রহও নেই। এখন দ্বীপ ছেড়ে পালাতে পারলেই সে বাঁচে।

কিং একটা বাঁকের কাছে আসতে দেখল সারা রাস্তা জুড়ে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে একদল প্রাণী। সবুজ রঙের ডাইনোসর এগুলো, লম্বায় ফুট চারেক হবে, গম্বুজের মত বড় মাথা, ছোট ছোট অনেকগুলো শিং মাথায়। এগুলোকে দেখে গ্রীন ওয়াটার বাফেলোর কথা মনে পড়ল কিং-এর। সজোরে ব্রেক কষল সে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল গাড়ি।

সবুজ ডাইনোসারগুলো তাকিয়ে থাকল গাড়ির দিকে; নড়ল না। স্টিয়ারিং হুইলে তবলা বাজাতে বাজাতে অপেক্ষা করতে লাগল হাওয়ার্ড কিং। কিন্তু দলটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে হর্ন বাজাল। জ্বালাল ফ্লাশ লাইট।

প্রাণীগুলো স্রেফ তাকিয়েই রইল।

ওগুলোর ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকাটা মোটেই পছন্দ করতে পারল না কিং। গাড়ি নিয়ে ধীরে সামনে বাড়ল সে, ডাইনোসারদের মাঝখান থেকে পথ করে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু ওরা কিংকে গ্রাহ্যই করল না। সামনের বাম্পার ধাক্কা খেল সবচেয়ে কাছের ডাইনোসারের গায়ে, ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল ওটা, পিছিয়ে গেল কয়েক পা, নোয়াল মাথা, তারপর দুম করে গাড়িটাকে দিল এক গুঁতো।

সর্বনাশ, আঁতকে উঠল কিং, সাবধান না হলে রেডিয়েটরের দফারফা হয়ে যাবে। আবার গাড়ি থামাল ও মোটর চালুই থাকল। আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল প্রাণীগুলো।

কয়েকটা ডাইনোসার শুয়ে পড়ল মাটিতে। ওগুলোর গায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি চালানো যাবে না।

সামনে নদীর দিকে তাকাল কিং। নৌকাটা আছে, সিকি মাইল দূরে হবে খুব বেশি জোর। ওদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একটা ধাক্কা খেল কিং। ডেকে, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে জেলেরা। নোঙর তুলে ফেলেছে। চলে যাচ্ছে ওরা।

এখানে বসে থাকার নিকুচি করি, ভাবল হাওয়ার্ড কিং। দরজা খুলে বেরিয়ে এল সে লাল গাড়িটাকে রাস্তার মাঝখানে রেখে। সাথে সাথে লাফিয়ে উঠল জানোয়ারগুলো। সবচেয়ে কাছের ডাইনোসরটা হামলা চালাল ওর ওপর। দরজা খোলা রেখেছিল কিং, ওটা গিয়ে লাফিয়ে পড়ল দরজার গায়ে, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ওটা, গভীর টোল পড়ল গায়ে। কিং পড়িমরি করে পাহাড়ের কিনারা ধরে দৌড় দিল। এখানে পাহাড় ঝট করে একশ ফুট নিচে নেমে গেছে, লাফিয়ে পড়ার সুযোগ নেই কোন। সামনের দিকে ঢাল অত খাড়া নয়। কিন্তু ওদিকে যাবার সময় নেই। ডাইনোসারগুলো একযোগে তেড়ে আসতে শুরু করেছে ওর দিকে। গাড়ি লক্ষ্য করে দৌড় দিল কিং। এই সময় আরেকটা জন্তু পেছনের টেইল লাইটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, ভেঙে চুরমার করে দিল প্লাস্টিক।

তৃতীয় প্রাণীটা সরাসরি গাড়ির পেছন দিকে হামলা চালাল। স্পেয়ার টায়ারে পা রেখে হাঁচড়ে পাঁচড়ে গাড়িতে উঠল কিং, ডাইনোসর এসে গুঁতো দিল বাম্পারে। ধাক্কার চোটে মাটিতে ছিটকে পড়ল কিং, জন্তুগুলো ঘিরে ধরল ওকে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে। লাফিয়ে উঠল কিং, দৌড় দিল রাস্তার বিপরীত দিক লক্ষ্য করে। ওদিকে টিলার মত উঁচু হয়ে আছে রাস্তা। ওখানে হোঁচট খেতে খেতে উঠে পড়ল হাওয়ার্ড কিং, ছুটল জঙ্গলের দিকে। কিন্তু ডাইনোসরগুলো ওর পিছু ধাওয়া করল না। দাঁড়িয়ে থাকল আগের জায়গায়। কারণটা একটু

পরেই জানতে পারল কিং। ভুল রাস্তায় এসে পড়েছে সে। এদিক থেকে বেরুনোর পথ নেই।

রাস্তার আরেক ধারে চলে এল কিং অনন্যোপায় হয়ে। এবার ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। কিন্তু সামান্য কিছুদূর এগোতেই ঘন অরণ্য গ্রাস করল ওকে। কয়েক কদম এগোতে কর্দমাক্ত ঢালে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল কিং। উঠে দাঁড়িয়ে দেখল একটা খাদের নিচে চলে এসেছে সে। পামগাছগুলো প্রত্যেকটা দশ ফুট লম্বা আর খুব ঘন। দু'হাত দূরেও নজর যায় না ভাল করে। কোথায় যাবে, কোনদিকে যাবে ঠাহর করতে পারল না আতঙ্কিত কিং। তারপর ভেজা পাতা মাড়িয়ে সামনের দিকে এগোতে শুরু করল সে।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। কিং চলে এল সমতল ভূমিতে। এদিক-ওদিক তাকাল। নৌকার চিহ্নও নেই কোথাও। মনে হল ভুল রাস্তায় চলে এসেছে সে। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত ঘাসের রাজ্য, নদীটা তার মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ করে চলে গেছে। নদীর তীরে প্রচুর ডাইনোসার, যদিও সমতল ভূমিটাকে নির্জন মনে হচ্ছে। কিং ঠিক করল নদী তীর ধরে এগোবে সে যতক্ষণ না নৌকাটাকে চোখে পড়ে। তবে শিংওলা টাইসেরাটপগুলোর ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে ওকে। না জানি কোনটা আবার লাফিয়ে পড়ে ঘাড়ে। কিন্তু ওকে নৌকায় পৌঁছুতেই হবে। সে ডাইনোসরের ভয় থাক আর নাই থাক।

হাঁটা শুরু করল হাওয়ার্ড কিং, ঠিক তখন পেছন থেকে ঝপঝপ শব্দ শুনল।

ফিরে তাকাল সে।

দুটো কালো, গায়ে চক্রাবক্রা দাগ, গিরগিটি নদী সাঁতরে এগিয়ে আসছে। পেছনের পায়ে ভর করে হাঁটছে ওগুলো, যেন লাফিয়ে চলছে। লম্বা চোয়াল হাঁ করল ওরা, দাঁত খিঁচাল কিং-এর দিকে চেয়ে।

নদীর দিকে আড়চোখে তাকাল কিং। আরো একটা গিরগিটি আসছে ওদিক থেকে, পেছনে দেখা গেল আরো একটাকে। সাঁতার কেটে আসছে সবগুলো।

নদী থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে লম্বা ঘাসের জঙ্গলে ঢুকে পড়ল কিং। তারপর শুরু করল দৌড়। ঘাসগুলো বুক সমান লম্বা, দৌড়াতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। মুখ হাঁ করে দম নিতে লাগল কিং। হঠাৎ ওর সামনে এসে হাজির হলো বিদঘুটে চেহারার আরেকটা গিরগিটি, হিসহিস আওয়াজ বেরুচ্ছে মুখ থেকে। ওটাকে ডজ দিয়ে আরেক দিকে দৌড় শুরু করেছে কিং এমন সময় গিরগিটিটা শূন্যে লাফ দিল ড্যাগারের মত ধারাল নখ বাঁকা করে।

একটুর জন্য কিং-এর নাগাল পেল না গিরগিটি ডাইনোসর। ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল কিং। প্রচণ্ড ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেছে। পেছনে পায়ের শব্দ হচ্ছে। হিংস্র প্রাণীগুলো তাড়া করছে ওকে।

সামনে বড় বড় গাছ দেখতে পেল হাওয়ার্ড কিং। কোন একটা গাছে উঠতে পারলে এ যাত্রা বেঁচেও যেতে পারে সে। জান বাজি রেখে দৌড় শুরু করল সে। ফুসফুস ফেটে যেতে চাইল, হাতে সাংঘাতিক ব্যথা, পা জোড়া ছিঁড়ে পড়তে চাইছে।

তারপরও গতি কমাল না কিং। আর মাত্র দশ গজ।

এই সময় ভারী কিছু একটা আঘাত করল ওকে পেছন থেকে, ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল কিং। পিঠে দারুণ জ্বালা করে উঠল। কিং বুঝতে পারল খুরের মত ধারাল নখ দিয়ে ওর পিঠ ফালাফালা করে ফেলছে শয়তানটা, কামড় বসাল ওটা, ছিঁড়ে আনল পিঠের

মাংস। ককিয়ে উঠল কিং, গড়িয়ে সরে যেতে চাইল। কিন্তু জগদ্দল পাথরের মত ওজনটাকে সারানো গেল না পিঠ থেকে। মাটির সাথে একেবারে যেন গেঁথে আছে কিং, মাংসাশী প্রাণীটার ঘোঁত ঘোঁতানি শুনতে পেল সে স্পষ্ট।

ঘাড়ের কাছে প্রাণীটার গরম নিশ্বাস টের পেল হাওয়ার্ড কিং, পরক্ষণে তীক্ষ্ণ একটা সূঁচ ফুটল ওখানে। ঘাড়ে কামড় বসিয়েছে ডাইনোসর। দুনিয়া অন্ধকার হয়ে আসার আগ মুহূর্তে কড়মড় একটা আওয়াজ শুনল কিং, ওর ঘাড়ের হাড় চিবাচ্ছে দানব।

তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে এল চোখের সামনে।

শুধুই অন্ধকার।

চব্বিশ

ডিম খুঁজতে গিয়ে ডাইনোসরের যে বাচ্চাটির পা মাড়িয়ে দিয়েছিল হাওয়ার্ড কিং, ওটাকে টাইরোনোসারের বাসা থেকে নিয়ে এসেছিল এডি ডজসনদের খুঁজতে গিয়ে। পা ভেঙে গিয়েছিল বাচ্চাটার, সাংঘাতিক আহত হয় সে। প্রায় মরো মরো অবস্থা। ওটাকে সুস্থ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় সারাহ্ হার্ডিং। এ ব্যাপারে পূর্ণ অভিজ্ঞতা তার ছিল আফ্রিকায় কাজ করতে গিয়ে। বাচ্চাটার পায়ে ছোটখাটো অপারেশন করেছে সে। অতিরিক্ত মরফিন দিয়ে ফেলেছিল এডি এটাকে সাথে নিয়ে আসার সময়। এ কারণে টাইরানোসারের বাচ্চা বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এখন অবশ্য আগের চেয়ে সুস্থ। যদিও এখনো জ্ঞান ফেরেনি। ট্রেলারেই আছে বাচ্চাটা তবে এডির এই কাজটাকে মোটেই সমর্থন করেনি রিচার্ড লেভিন। সে বারবার বলেছে এ কারণে সবাইকে ভুগতে হতে পারে। তবে লেভিনের কথা এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে কল্পনাও করেনি কেউ।

সারাহ্ এবং আয়ান ম্যালকম ট্রেলারে বসে গল্প করছিল, হঠাৎ টের পেল ওদের পায়ের নিচের মাটি থরথর করে কাঁপছে। সারাহ্ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই বড় বড় হয়ে গেল চোখ। ফিসফিস করে বলল, আয়ান, দেখ।

ম্যালকম সারাহ্র পাশে এসে দাঁড়াল।

সারাহ্ আঙুল দিয়ে কাছের গাছগুলোর দিকে ইঙ্গিত করছে।

কি ? জিজ্ঞেস করল ম্যালকম।

আর তক্ষুণি ওটাকে দেখতে পেল সে। গাছের মগডাল ছাড়িয়ে জেগে উঠেছে বিরাট একটা মাথা, এদিক-ওদিক দুলছে, যেন কিছু শুনছে। ওটা একটা বিশালদেহী টাইরানোসরাস রেক্স।

আয়ান, আবার ফিসফিস করল সারাহ্ ও একা নয়।

ডানদিকে, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে দ্বিতীয় ডাইনোসর, এটা মেয়ে ডাইনোসর, পুরুষটার চেয়ে অনেক বড়। রাতের আঁধারের নৈঃশব্দ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ওদের সুতীব্র চিৎকারে, দু'জনে এক সাথে এগোল ট্রেলারের সামনে ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ্য করে। হেডলাইটের তীব্র আলোতে ঝলসে গেল চোখ, পিটপিট করল।

বাচ্চাটার বাবা-মা নাকি?

জানি না ঠিক। তবে বাবা-মাই হতে পারে।

কাপড়ের স্ট্রাপে বাঁধা টাইরোনোসারের বাচ্চাটা শুয়ে আছে একটা টেবিলের ওপর, কম্বল জড়ানো। এখনো অজ্ঞান। তবে নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে।

ওরা নিশ্চয়ই বাচ্চার খোঁজে এসেছে, বলল সারাহ্। রাস্তার চিহ্ন খুঁজে এসেছে।

টাইরানোসার দুটো মাথা তুলল আকাশের দিকে, মুখ হাঁ করল। তারপর ডানে এবং বাঁয়ে ধীরে ধীরে মাথা দোলাতে লাগল। অবশেষে এক পা বাড়াল ট্রেলারের দিকে।

আয়ান, কেঁপে গেল সারাহ্র গলা। ওরা এদিকেই আসছে। কি করি বলো তো?

জানি না, গলা খাদে নামাল ম্যালকম।

জানালার কাছ থেকে সরে এল দু'জনে, প্যাসেজওয়েতে পাশাপাশি হামাগুড়ি দিয়ে বসল। টাইরানোসার দুটো এগিয়ে আসতেই থাকল। প্রতিটি পা ফেলার সময় থরথর করে কেঁপে উঠল মাটি। প্রথম টাইরানোসার ট্রেলারের এত কাছে চলে এল যে গোটা জানালা ঢাকা পড়ল অতিকায় শরীরের আড়ালে। ম্যালকম ওটার পেশীবহুল, শক্তিশালী পা জোড়া দেখতে পাচ্ছে। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে বলে মাথা দেখা যাচ্ছে না।

তারপর দ্বিতীয় ডাইনোসারটাকে বিপরীত দিকে দেখা গেল। ট্রেলারটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল দুই বিশালদেহী দানব, এক নাগাড়ে গর্জন করেই চলেছে। ওদের গা থেকে বিদঘুঁটে গন্ধ আসছে। একটা ডাইনোসার ট্রেলারের এক পাশে ধাক্কা খেল, আঁশালো শরীরে খরখর শব্দ উঠল ধাতুর সাথে সংঘর্ষে।

আতংক অনুভব করছে ম্যালকম, ঘামতে শুরু করেছে। সারাহ্কে চোখের কোন দিয়ে দেখল সে। চুপচাপ প্রাণী দুটোর নড়াচড়া দেখছে সারাহ্। ওরা শিকারের খোঁজে আসেনি, ফিসফিস করে বলল সে। মনে হচ্ছে কিছু খুঁজছে।

কানের পাশে বোমা পড়ল যেন, বিকট গলায় গর্জন ছাড়ল এক ডাইনোসর। সাথে সাথে অন্যটা দ্বিগুন জোরে চিৎকার করে প্রত্যুত্তর দিল। ভয়ের চোটে ম্যালকম নিজেকে মেঝের সাথে প্রায় মিশিয়ে ফেলতে চাইল। সারাহ্ তার গায়ের ওপর চেপে বসল। ওর হাতের গুঁতো লাগল ম্যালকমের কানে।

ম্যালকম ফিসফিসিয়ে বলল, একটু সরো, প্লীজ।

সারাহ্ সরে গেল এক পাশে, ধীরে ধীরে উঠে বসল ম্যালকম। সিটের কুশনের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। টাইরানোসার রেক্স ঠিক তার দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে আছে। ওটার খর চোখ খুলল আবার বন্ধ হলো। কাঁচের গায়ে জানোয়ারটার গরম নিশ্বাস পড়ে সৃষ্টি হল বাষ্প।

টাইরানোসারটার মাথা সরে গেল জানালা থেকে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ম্যালকম। সাথে সাথে দারুণ চমকে উঠল সে দড়াম শব্দে। ডাইনোসর মাথা দিয়ে গুঁতো মেরেছে ট্রেলারে।

ভয় নেই সারাহ্, বলল ম্যালকম। ট্রেলারটা যথেষ্ট মজবুত।

সারাহ্ বলল, এ জন্যই তো এখনো ভয় পাইনি।

বিপরীত দিক থেকে আরেকটা ডাইনোসর মাথা দিয়ে ধাক্কা দিল ট্রেলারে সর্বশক্তি দিয়ে। থরথর করে কেঁপে উঠল যান্ত্রিক কাঠামোটা।

তারপর একের পর এক নিয়মিত ছন্দে দুই দানব দু'পাশ থেকে ট্রেলারটাকে গুঁতোতে

আর ধাক্কাতে শুরু করল। ধাক্কার চোটে ম্যালকম আর সারাহ্ একবার এদিক, আরেকবার ওদিক ছিটকে যেতে লাগল। সারাহ্ একবার দাঁড়াতে চেষ্টা করল, পরক্ষণে রাম ধাক্কায় ছিটকে পড়ল মেঝেতে। টেবিলের ওপর ল্যাবরেটরীর জিনিসপত্রগুলোর যেন পাখা গজাল। এদিক-সেদিক উড়তে শুরু করল। কাঁচ ভেঙে বিশ্রী অবস্থা।

তারপর হঠাৎ ধাক্কাধাক্কি থেমে গেল। নেমে এল আশ্চর্য নীরবতা।

সারাহ্ হাত আর হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে বায়োলজি ল্যাবের কাছে চলে এল। ম্যালকম এল তার পেছন পেছন। দু'জনেই দেখল প্রকাণ্ডদেহী টাইরানোসার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে তাদের বাচ্চাকে দেখছে। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হচ্ছে।

তারপর থেমে গেল ওটা, জানালা দিয়ে তাকিয়ে আবার গর্জন ছাড়ল। ওটা মা টাইরানোসার।

বাচ্চাটাকে ওরা ফেরত চাইছে, আয়ান, নিচু গলায় বলল সারাহ্।

নিজেকে মেঝের সাথে প্রায় মিশিয়ে দিতে দিতে ম্যালকম বলল, কিন্তু ফেরত দেব কি করে?

দরজা দিয়ে ঠেলে দিই?

বলেই লাফিয়ে উঠল সারাহ্, মুখোমুখি দাঁড়াল টাইরানোসারের। নরম, মসৃণ গলায় কথা বলতে শুরু করল। সব ঠিক আছে .... তোমার বাচ্চা সুস্থ আছে .... এই দেখ আমি ওর বাঁধন খুলে দিচ্ছি ...

জানালার বাইরের প্রকাণ্ড মাথাটা গ্লাস ফ্রেমটাকে সম্পূর্ণ ঢেকে রেখেছে। সারাহ্ দেখল ঘাড়ের চামড়ার নিচে শক্তিশালী পেশীগুলো ফুটে আছে প্রকটভাবে। চোয়াল জোড়া সামান্য নড়ে উঠল। স্ট্র্যাপ খোলার সময় কাঁপতে শুরু করল সারাহ্র হাত।

এইতো সব ঠিক আছে .... দেখো তোমার বাচ্চা কত সুস্থ আছে ......

সারাহ্র পায়ের নিচে গুটিসুটি মেরে বসে আছে ম্যালকম, ফিসফিস করে বলল, করছ কি তুমি?

সারাহ্ গলার স্বর একটুও পরিবর্তন না করে বলল, জানি, এটা পাগলের কাজ মনে হচ্ছে ..... তবে সিংহদের সাথে এ কাজ আগেও করেছি ..... মাঝে মাঝে। .... এই যে তোমার বাচ্চা এখন মুক্ত।

স্ট্র্যাপ খুলে ফেলেছে সারাহ্, মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্ক সরাল, একই সাথে নরম গলায় কথা বলে চলেছে সে। এখন ..... আমাকে যা করতে হবে .... বাচ্চাটাকে দু'হাতে তুলে উঁচু করে ধরল সে। তোমার কাছে ওকে পৌঁছে দেয়া......।

হঠাৎ, মা টাইরানোসার পিছিয়ে নিয়ে গেল মাথা, পরক্ষণে দড়াম করে আঘাত হানল জানালায়, সাথে সাথে কাঁচে মাকড়সার জালের মত চিড় ধরল। আবার জানালায় মাথার ছায়া দেখে বাচ্চাটাকে একটা ট্রের ওপর রেখে এক লাফে পিছিয়ে এল সারাহ্। আবার আঘাত করল টাইরানোসার, জানলার কাঁচ ভেঙে শতধা হলো। ট্রেইলারের অনেকখানি ভেতরে মাথা ঢুকে গেল ওটার। নাক রক্তে মাখামাখি, কাঁচের টুকরো গেঁথে আছে মাংসে। বাচ্চাটার গায়ের গন্ধ শুঁকল মা। বাচ্চার বুকে আলতোভাবে মাথা রাখল। চোখ দুটো পিটপিট করতে লাগল সারাহ্র দিকে চেয়ে।

মেঝেতে শুয়ে ছিল ম্যালকম, উঠতে গেলে ওকে বাধা দিল সারাহ্। শ্‌শ্‌শ্। বলল সে ঃ হচ্ছেটা কি?

বাচ্চার হার্টবিট শুনছে ওটা।

ঘোঁতঘোঁত করে উঠল টাইরানোসার, খুব আস্তে দুই চোয়ালের ফাঁকে বন্দী করল সন্তানকে, তারপর ভাঙ্গা জানালা দিয়ে বাচ্চাসহ পিছিয়ে গেল।

ওদের দৃষ্টিসীমার বাইরে, বাচ্চাকে মাটিতে শোয়াল মা। ঠোঁট দিয়ে চাটতে শুরু করল শিশুকে। সারাহ্ উঁকি দিল জানালা দিয়ে। বাচ্চাটা নড়াচড়া করল না কিছুক্ষণ। ভয় হল সারাহ্‌র ওটাকে বেশি মরফিন দেয়া হয়নিতো? মরে যায়নিতো বাচ্চা?

সারাহ্‌র দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে নড়ে উঠল টাইরানোসারের বাচ্চা। কোমল কিন্তু তীক্ষ্ম গলায় চিৎকার দিল একটা। মা তার সন্তানকে আবার মুখে তুলে নিল, তারপর একটা গাছের দিকে এগোতে শুরু করল। বাবা টাইরানোসার অনুসরণ করল ওদের দু'জনকে। ম্যালকম ইতিমধ্যে উঠে বসেছে। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে মন্তব্য করল সে, যা বাব্বা! বাঁচা গেল।

হ্যাঁ বাঁচা গেল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের রক্ত মুছল সারাহ্ হার্ডিং।

কিন্তু আসলে বাঁচা গেল না। ওরা দেখল সবচেয়ে কাছের গাছটাতে টাইরানোসার দুটো থেমে দাঁড়াল, তারপর মগডালে, নিরাপদ একটা জায়গায় বাচ্চাটাকে মুখ থেকে নামিয়ে শুইয়ে দিল মা। কিছুক্ষণ বাচ্চার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। দেখল সন্তান ঠিক আছে কি না। খানিকক্ষন দেখেটেখে ঘুরে দাঁড়াল ওটা, হাঁ করল মুখ, ছাড়ল তীব্র গর্জন।

প্রত্যুত্তরে পুরুষ টাইরানোসারও গর্জে উঠল। আর তারপর দুই অতিকায় প্রাণী পূর্ণগতিতে ছুটে আসতে শুরু করল ম্যালকমদের ট্রেলার লক্ষ্য করে।

ওহ্ মাইগড! আর্তনাদ করে উঠল সারাহ্।

সাবধান, সারাহ্, চিৎকার করে বলল ম্যালকম। আর কিন্তু রক্ষা নেই।

বলতে না বলতে দুজনে ছিটকে পড়ল দু'দিকে। ভয়ানক জোরে ট্রেলারটাকে ধাক্কা মেরেছে দুই দানব। গ্লাসওয়্যার আর ল্যাব ইকুইপমেন্ট একটাও আস্ত থাকল না। চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল ম্যালকম, তাকিয়ে দেখল ওর ঠিক মাথার ওপরে ভাঙ্গা জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে বিরাট এক দানব ওর দিকে মুখ ভেংচাচ্ছে। টাইরানোসারদের থাবা খচমচ করে উঠল ট্রেলারের ধাতব গায়ে। একটু পরে মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল জানালার ধার থেকে। ম্যালকম শুনল টাইরানোসার দুটো গর্জন করছে। টের পেল ঠেলতে শুরু করেছে ওরা ট্রেলারটাকে।

ম্যালকম চিৎকার করে ডাকল, সারাহ্। ওর পেছনেই ছিল সারাহ্। কিন্তু সে জবাব দেয়ার আগেই দুনিয়াটা বনবন করে ঘুরতে শুরু করল। প্রবল এক ধাক্কার শব্দ, পরক্ষণে দেখা গেল উল্টে গেছে ট্রেলার। ম্যালকম গাড়ির ছাদে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল, সারাহ্‌র কাছে পৌঁছতে চাইছে। ল্যাব ইকুইপমেন্টের দিকে তাকাল সে। মাথার ঠিক ওপরে কতগুলো ল্যাব বেঞ্চ, শিশি-বোতল থেকে টপটপ করে তরল পদার্থ পড়তে শুরু করেছে। কাঁধটায় জ্বালা করে উঠল ম্যালকমের, মৃদু হিসহিস শব্দ শুনল সে। প্রবল এসিড পড়েছে গায়ে।

ট্রেলারের ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার। বাতির তারটার বোধহয় ছিঁড়ে গেছে। হঠাৎ ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের আলোতে ম্যালকম দেখল সারা ভাঙা 'দ' হয়ে পড়ে আছে দুটো ট্রেলারকে সংযুক্ত করে রেখেছে যে অ্যাকর্ডিয়ান জংশন, সেখানে।

জাংশনটা মুচড়ে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, তার মানে দ্বিতীয় ট্রেলারটা এখনো খাড়া অবস্থায় আছে। অদ্ভুত ব্যাপার।

বাইরে গর্জন করছে টাইরানোসাররা ভোঁতা বিস্ফোরণের শব্দ কানে এল ম্যালকমের। ওরা টায়ারে কামড় বসাচ্ছে।

হঠাৎ, টাইরানোসার দুটো ট্রেলারটাকে আবার ধাক্কা দিতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর থেমে গেল

সারাহ্‌র কাছে তখন আসার সুযোগ পেল ম্যালকম। আয়ান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ম্যালকমকে। ওর মুখের বাঁ দিকটা কালচে লাগল। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতে ম্যালকম দেখল, মুখের এ পাশটা রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে।

তুমি ঠিক আছো তো? বলল ম্যালকম।

হ্যাঁ, ঠিক আছি, চোখ থেকে রক্ত মুছল সারাহ্‌।

এটা কি বলতো?

আবার ঝলসানো বিদ্যুতের আলোয় ম্যালকম দেখল বড় একটা কাঁচের টুকরো, সারাহ্‌র ঘাড়ের কাছে গেঁথে আছে। সে ওটা ধরে টান দিল, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। হাত মাখামাখি হয়ে গেল ম্যালকমের। ওরা এখন রান্না ঘরে, ম্যালকম একটা ডিশ টাওয়েল নিয়ে এল স্টোভের ওপর থেকে, সারাহ্‌র মাথায় চেপে ধরল। দ্রুত ওটা কালচে হয়ে উঠল অন্ধকারে।

ব্যথা লাগছে?

না, ঠিক আছে।

মনে হয় না, খুব খারাপ অবস্থা তোমার, ওকে সান্ত্বনা দিল ম্যালকম। বাইরে গর্জন করে উঠল টাইরানোসার।

ওরা করছেটা কি? ভোঁতা গলায় জিজ্ঞেস করল সারাহ।

টাইরানোসার দুটো আবার ধাক্কা মেরে মেরে ঠেলতে শুরু করছে ট্রেলারটাকে। ক্রমশ ঢালের দিকে নেমে যাচ্ছে ট্রেলার।

ওরা আমাদের ঠেলতে শুরু করেছে বলল ম্যালকম।

কোথায় আয়ান?

খাদের ধারে, খাদটা খাড়া পাঁচশ ফুট নেমে গেছে। একবার পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই।

সারাহ্‌ ম্যালকমের হাতটা সরিয়ে দিয়ে নিজেই ডিশ টাওয়েলটা ঠেসে ধরল মাথায়। কিছু একটা করো।

ভাবছি কি করা যায়, বলল ম্যালকম।

কিন্তু কি করবে কিছুই মাথায় আসছে না ম্যালকমের। গোটা ট্রেলার গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে, আউট হয়ে গেছে পাওয়ার, পায়ের নিচে ধারালো কাঁচ, আর সে–

আবার দড়াম করে ধাক্কা : ছিটকে পড়ল ম্যালকম। শক্ত কিসের সাথে যেন বাড়ি খেল। উহ্‌ করে উঠল সে।

আয়ান ...

আবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। আতংকিত হয়ে আয়ান ম্যালকম দেখল ধাক্কাতে ধাক্কাতে দানবদুটো ট্রেলারটাকে খাদের কিনারে নিয়ে এসেছে, এখন ওটা উল্টে যেতে শুরু করেছে। পতনটা হলো অবিশ্বাস্য গতিতে। ম্যালকম দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল ঠাণ্ডা, ধাতব একটা দরজা। এটা রেফ্রিজ্যারেটর। কিন্তু দরজাটা পেছল, ধরে রাখা যাচ্ছে না। হাত পিছলে গেল ম্যালকমের, ডিগবাজি খেতে খেতে সে ছিটকে চলে গেল ট্রেলারের শেষ মাথায়। দেখল বিদ্যুৎগতিতে ড্রাইভারের সিটটা ছুটে আসছে তার দিকে, কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার আগেই অন্ধকারে কিসের সাথে যেন ভয়ানক বাড়ি খেল ম্যালকম, তীব্র একটা ব্যথা অনুভব করল সে শরীরে।

পরক্ষণে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে এল তার কাছে।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রিচার্ড লেভিনের আস্তানার ছাদে এক নাগাড়ে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ। লেভিন বাইনোকিউলার চোখে লাগিয়ে পাহাড়ের দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল। আর্বি জানতে চাইল, কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

বুঝতে পারছি না ঠিক, বলল সে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টি বেশি দূর যায় না। খানিক আগে তীব্র আতংক নিয়ে সে দেখেছে দুটো টাইর‍্যানোসার ম্যালকমদের ট্রেলারটাকে ঠেলতে ঠেলতে খাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বিশটনি দুটো জানোয়ারের পক্ষে দু'টন ওজনের একটা গাড়ি ঠেলে ফেলে দেয়া বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু তারপর কি হয়েছে জানে না লেভিন। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠতে ভয়ে জমে গেল সে। প্রথম ট্রেলারটা নেই হয়ে গেছে পাহাড় থেকে। ওটা শূন্যে ঝুলছে, পাহাড়ের ওপর দ্বিতীয় ট্রেলারের অ্যার্কডিয়ান কানেক্টরের সাথে এখনো সংযুক্ত হয়ে আছে বলে রক্ষা। নইলে এতক্ষণে খবর হয়ে যেত।

ঐ কানেক্টর বেশিক্ষণ ওজন ধরে রাখতে পারবে না, চেঁচিয়ে বলল এডি।

বিদ্যুতের আলোতে সবাই দেখল দানব দুটো এবার দ্বিতীয় ট্রেলারটাকে পাহাড় চূড়ো থেকে ফেলে দেয়ার মতলব করছে। ধাক্কা দিচ্ছে।

থর্ন ঘুরলেন এডির দিকে। আমি যাচ্ছি।

আমিও যাব আপনার সাথে।

না! তুমি বাচ্চাদের সাথে থাকো।

কিন্তু আপনার–

বাচ্চাদের সাথে থাকো। ওদের একা রেখে কোথাও যাবে না।

কিন্তু লেভিন আছেন–

না, তুমি থাকো! বললেন থর্ন। তিনি ইতিমধ্যে উঁচু মাচান বেয়ে নামতে শুরু করেছেন। বৃষ্টির মধ্যে লাফিয়ে উঠলেন গাড়িতে। এখান থেকে তিন মাইল দূরে ম্যালকমরা, দ্রুত হিসেব কষছেন তিনি, দ্রুত গাড়ি চালালেও সাত থেকে আট মিনিট লাগবে ওখানে পৌঁছতে।

হয়তো ততক্ষণে দেরী হয়ে যাবে অনেক।

কিন্তু তাঁকে চেষ্টা করতেই হবে।

মড়মড় করে কিছু একটা ভেঙে যাবার শব্দে চোখ মেলে তাকাল সারাহ্ হার্ডিং।

কালির মতো অন্ধকার, কিন্তু ঠাহর করা যাচ্ছে না। হঠাৎ ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে সারাহ্ দেখল তারা শূন্যে ঝুলছে, পাঁচশ' ফুট নিচে গহীন খাদ। খাদটা মৃদু দুলছে

চোখের সামনে।

ট্রেলারের উইন্ডশীল্ড দিয়ে তাকিয়ে আছে সারাহ্, চোখে রক্ত জমে আছে বলে ভাল করে কিছু ঠাহর করা যাচ্ছে না। শার্টের কোনা ছিড়ে টুকরো করল সারাহ্, তারপর কাটা কপালে চেপে ধরল ব্যান্ডেজ। জ্বালা করে উঠল খুব, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল সে।

ম্যালকম ওর কাছে থেকে হাত দশেক দূরে, একটা ল্যাব টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, নড়ছে না।

আয়ান, ডাকল সারাহ্।

জবাব দিল না ম্যালকম। নড়লও না।

ট্রেলারটা ঝাঁকুনি খেল হঠাৎ, আবার শোনা গেল মড়মড় আওয়াজে। সারাহ্ বুঝতে পারল কি হচ্ছে। প্রথম ট্রেলারটা স্রেফ শূন্যে ঝুলে আছে, তবে দ্বিতীয় ট্রেলারটার সাথে এখনো সংযুক্ত আছে অ্যাকর্ডিয়ান কানেক্টরের সাথে। ওপরে, টাইরানোসারগুলো দ্বিতীয় ট্রেলারটাকে পাহাড় চূড়ো দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে।

আয়ান, ডাকল সে, আয়ান।

জবাব না পেয়ে শরীরের ব্যথা অগ্রাহ্য করে উঠে বসল সারাহ্। মাথা ঝিমঝিম করছে, কে জানে কতখানি রক্ত পড়েছে শরীর থেকে। একটা টেবিল আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। তারপর দেয়ালের একটা হ্যান্ডেল ধরে ফেলল, ওর পায়ের নিচে দোল খেল ট্রেলার।

হ্যান্ডেল ছেড়ে রেফ্রিজারেটরের দরজা আঁকড়ে ধরল সারাহ্, ওয়্যার শেলফের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল আঙুল। তারপর সাবধানে পা তুলল, হাত বাড়িয়ে ওভেনের হাতল ধরে ফেলল।

এ যেন পাহাড়ে চড়ছি, ভাবল সারাহ্। এভাবে একটার পর একটা জিনিস ধরে ধরে ম্যালকমের কাছে চলে এল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল ম্যালকমের মুখখানা দারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত। গুঙিয়ে উঠল ম্যালকম। সারাহ ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল ম্যালকমের আঘাত কতটা মারাত্মক।

আয়ান, ডাকল সে।

ওর চোখ বন্ধ। বলল, দুঃখিত।

না, ঠিক আছে।

আমিই তোমাকে এর মধ্যে টেনে এনেছি।

আয়ান, তুমি নড়তে পারবে?

গুঙিয়ে উঠল আয়ান। আমার পা।

আয়ান আমাদেরকে কিছু একটা করতেই হবে।

টাইরানোসারের গর্জন শোনা গেল আবার। এ গর্জনের যেন কোনো শেষ নেই মনে হলো সারাহ্র। ট্রেলারটা আবার দুলে উঠল ক্যাঁচম্যাচ শব্দে।

আয়ান, ডাকল সারাহ্, সময় নেই একদম, কিছু একটা করো।

মাথা তুলল ম্যালকম, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল সারাহ্র দিকে। আবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। নড়ে উঠল ম্যালকমের ঠোঁট, পাওয়ার।

কি?

পাওয়ার অফ।

প্রথমে সারাহ্ কিছুই বুঝতে পারল না ম্যালকম কি বলছে। তারপর মনে পড়ল ম্যালকম পাওয়ার অফ করে দিয়েছিল। প্রথমে হেডলাইটের আলোতে টাইরানোসারেরা কাছে আসতে ভয় পাচ্ছিল। আবার আলো জ্বালাতে পারলে ওগুলো ভয় পেতে পারে।

আমাকে কি পাওয়ার অন করতে বলছো?

হ্যাঁ, ভাঙ্গা পুতুলের মত মাথা দোলাল ম্যালকম। পাওয়ার অন করো।

কিভাবে, অন্ধকারে চারদিকে একবার চোখ বুলাল সারাহ্।

একটা প্যানেল আছে।

কোথায়?

কথা বলল না ম্যালকম। তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল সারাহ্। আয়ান, প্যানেলটা কোনদিকে?

নিচের দিকে আঙ্গুল দেখাল ম্যালকম।

ওদিকে তাকাল সারাহ্। প্যানেল থেকে ছেঁড়া তার ঝুলছে 'পারব না। তার ছিঁড়ে গেছে।'

ওপরে......

ম্যালকমের কথা প্রায় শুনতেই পেল না সারাহ্। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল দ্বিতীয় ট্রেলারের ভেতরে আরেকটা কন্ট্রোল প্যানেল আছে। ওদিকে যেতে পারলে পাওয়ার অন করা যাবে।

ঠিক আছে, আয়ান, বলল সে। যাচ্ছি আমি। ওপর পানে উঠতে শুরু করল সারাহ্। ট্রেলারের ছাত ত্রিশ ফুট নিচে। গর্জে উঠল টাইরানোসার, আবার লাথি মারল। শূন্যে ঝুলতে লাগল সারাহ্।

অ্যাকর্ডিয়ান প্যাসেজ ধরে দ্বিতীয় ট্রেলারে পৌঁছানোর মতলব করছে সারাহ্। কিন্তু ওপরে এসে বিদ্যুতের আলোয় দেখল আর এগোন সম্ভব নয়। অ্যাকর্ডিয়ান প্যাসেজ দুমড়ে মুচড়ে গেছে। হতাশায় ভেঙে পড়ল সারাহ্।

আর দু'একটা লাথি খেলেই ট্রেলার ছিটকে পড়ে যাবে নিচে। বাঁচবে না ওরা কেউ।

ঠিক তখন ওপরে দ্বিতীয় ট্রেলারটায় লাথি মারতে শুরু করল প্রাগৈতিহাসিক দুই দানব।

উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার দুটো একভাবে আগুপিছু করছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে গাড়ির গতি না কমিয়েই রাস্তার বাঁকগুলো পার হয়ে আসতে লাগলেন ডঃ থর্ন। ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। মিনিট দুই চলে গেছে। তিন মিনিটও হতে পারে।

রাস্তাটা ভীষণ পেছল এবং বিপজ্জনক। গভীর খানাখন্দগুলোর ওপর দিয়ে লাফিয়ে যাবার সময় প্রতিবার দম বন্ধ করে থাকলেন জ্যাক থর্ন। কিন্তু একবার একটা গর্তে পড়ে গিয়ে গাড়ি আর উঠল না। বন বন করে চাকা ঘুরল। ফোয়ারার মত ছিটকে উঠল পানি, গাড়ি গর্তে পড়েই থাকল। তারপর হঠাৎ এক সময় বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। ইগনিশন কি ঘোরালেন থর্ন। কোনো কাজ হলো না। সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। মনে করার চেষ্টা করলেন ঠিক কোন জায়গাটায় আছেন: হিসেব কষে দেখলেন ম্যালকমদের ট্রেলার যেখানে পড়ে আছে, জায়গাটার দূরত্ব এখান থেকে এক মাইলেরও বেশি হবে। স্রেফ পায়ে হেঁটে ওখানে যাবার প্রশ্নই ওঠে না এই মুহূর্তে।

সামনের বাঁকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো ওখানটায় আবছা মতো, লাল রঙের কি যেন একটা দেখতে পেয়েছেন তিনি। চোখ কচলালেন থর্ন। না, ভুল দেখেননি। সত্যি বাঁকের কাছে লালচে কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে।

লিনস্ট্রোডট রাইফেলটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন থর্ন, মাথা নিচু করে দৌড়ালেন। বৃষ্টির ভেতর পাহাড়ে রিজ রোডের সংযোগস্থল লক্ষ্য করে ছুটলেন। মোড়ের কাছে আসতেই লাল রঙের জিপ গাড়িটাকে চোখে পড়ল তাঁর, রাস্তার মাঝখানে পড়ে আছে, জ্বলছে টেইললাইট দুটো। একটা লাইট ভেঙে গেছে, ঝলসাচ্ছে সাদা আলো।

গাড়ির ভেতরে কেউ নেই। ড্রাইভারের সিটের পাশের দরজাটাও খোলা। গাড়িতে উঠে পড়লেন থর্ন। বাহ্ চাবিজোড়া যথাস্থানে আছে। ইগনিশন ঘোরালেন থর্ন। প্রাণ ফিরে পেয়ে গর্জন করে উঠল লাল গাড়ি। থর্ন ছুটলেন খাদের দিকে।

অল্প কয়েকটা বাঁক ঘুরতে ল্যাবরেটরীর সবুজ ছাদ চোখে পড়ল থর্নের, বাঁ দিকে মোড় নিতেই হেডলাইটের আলোয় দেখতে পেলেন ডাইনোসার দুটো ম্যালকমদের ট্রেলারটাকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করছে।

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দানব দুটো হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। থর্নের জিপের দিকে চেয়ে গর্জন করে উঠল। ট্রেলার ঠেলার কাজ বাদ দিয়ে রাক্ষসের মত ছুটে এল লাল গাড়ির দিকে। তাড়াতাড়ি উল্টো দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেললেন থর্ন। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলেন ডাইনোসর দুটো তাকে আক্রমণ করতে আসছে না। তারা থর্নের কাছের একটা গাছ লক্ষ্য করে ছুটছে। গাছটির নিচে এসে থেমে দাঁড়াল দু'জন, মাথা তুলল। থর্ন আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কি ঘটে তা দেখার জন্য। বিদ্যুতের আলোয় দেখলেন ওরা ওদের বাচ্চাটাকে নামিয়ে আনল গাছ থেকে, তারপর নাক ঘষতে লাগল বাচ্চার গায়ে। সন্দেহ নেই, থর্নের আকস্মিক উপস্থিতিতে শিশুর নিরাপত্তার কথা ভেবে ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

আবার বিদ্যুৎ চমকালে থর্ন দেখলেন ডাইনোসর দুটো নেই। চলে গেছে তাদের বাচ্চাকে নিয়ে। সত্যি গেছে নাকি ঘাপটি মেরে আছে কোথাও? জানালার কাঁচ নামিয়ে বৃষ্টির মধ্যে মাথা বের করলেন থর্ন। নাহ্, ডাইনোসরদের কোনই সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

আবার হেডলাইট অন করলেন থর্ন, সামনে বাড়লেন ধীর গতিতে। গাড়ির ম্লান আলোয় দ্বিতীয় ট্রেলারটাকে চোখে পড়ল তার।

অনবরত ধাতব ক্যাঁচম্যাচ শব্দ তুলে ভেজা ঘাসের ওপর থেকে আস্তে আস্তে পিছলে যাচ্ছে ওটা। নেমে যাচ্ছে খাদের কিনারে, পাহাড় চূড়োয়।

ঝটপট গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন জ্যাক থর্ন হাতে জিপের কপিকলের বড় হুকটা নিয়ে। ট্রেলারটা তাঁর কাছ থেকে একটু একটু করে সরে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে ওটার নিচে ঢুকে পড়লেন, হুকটা আটকে দিলেন পেছনের অ্যাক্সেলের সাথে। টেনেটুনে দেখলেন ব্রেক কভারের সাথে ঠিকঠাক মত হুকটা আটকেছে কিনা। তারপর গড়ান দিয়ে ট্রেলারের তলা থেকে বেরিয়ে এলেন, একটুর জন্য ওটার নিচে চাপা পড়লেন না।

কপিকলের ধাতব তার টানটান হয়ে গেল, মনে হল ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু ছিঁড়ল না। জিপের চাকার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন থর্ন। না, ওগুলো ঘুরছে না। তারপর তারটা কাছের একটা গাছে বেঁধে ফেললেন শক্ত করে। এখন আর দ্বিতীয় ট্রেলারটা পাহাড়

থেকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা রইল না।

রেডিও বেজে উঠল জিপের ভেতর। এডি।

জবাব দিলেন থর্ন, হ্যাঁ বলো। এডি।

আপনি ট্রেলারটাকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন?

পেরেছি। ওটা আর গড়িয়ে নামছে না।

দারুন। কিন্তু ডক্টর, আপনি তো জানেন কানেক্টরটা বেশিক্ষণ ভার সহ্য করতে পারবে না। কাজেই...

জানি এডি। আমি ওদের উদ্ধার করার ব্যবস্থা এক্ষুণি করছি। নাইলনের দড়ি বেঁধে নিচে নামব। আশাকরি এই সময়ের মধ্যে কোন অঘটন ঘটবে না। বলে রেডিও অফ করে দিলেন ডঃ জ্যাক থর্ন।

পঁচিশ

রিচার্ড লেভিনের হাইড আউট।

লেভিন চোখে নাইট গগলস লাগিয়ে তাকিয়ে ছিল পাহাড় চূড়োর দিকে। দুইপাশে দুই সাগরেদ। কেলী এবং আর্বি। ওরা অধৈর্য গলায় বারবার জানতে চাইল থর্ন কি করছেন। ধৈর্য ধরে কমেন্ট্রি দিয়ে গেল লেভিন।

এখন কি করছেন থর্ন? জিজ্ঞেস করল কেলী।

দড়ি বেয়ে খাদে নেমেছেন তিনি। ঢুকে পড়েছেন ট্রেলারের মধ্যে। একজন বেরিয়ে আসছে।

কে?

মনে হয় সারাহ্। ও অন্যদেরকে বের করছে ট্রেলারের ভেতর থেকে।

কেলী বৃষ্টির মধ্য থেকে দেখতে চেষ্টা করল দূরের দৃশ্যটা। বর্ষণ প্রায় থেমে গেছে, গুড়িগুড়ি পড়ছে এখন। উপত্যকার ওপরে, ট্রেলারটা এখনো দুলছে শূন্যে।

হঠাৎ আঁতকে উঠল লেভিন। সর্বনাশ! ঝুলন্ত ট্রেলারটা এইমাত্র ছিটকে পড়ল নিচে।

আর্তনাদ করে উঠল কেলী এবং আর্বি।

লেভিন বলল না! না! ওদের কিছু হয়নি। ওরা দ্বিতীয় ট্রেলারে উঠতে পেরেছে।

সবাই? দুরুদুরু বুকে প্রশ্ন করল কেলী।

হ্যাঁ সবাই।

আনন্দে লাফাতে লাগল কেলী।

আর্বি ঘুরে দাঁড়াল, টান দিয়ে লেভিনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল গ্লাস জোড়া।

আরে, আরে খেঁকিয়ে উঠল লেভিন। 'তুমি...'।

এক মিনিট ডঃ লেভিন, বলল আর্বি। চরকির মত ঘুরল সে, তাকাল অন্ধকার সমতল ভূমির দিকে। আবছা, সবুজ একটা ছায়া ছাড়া প্রথমে কিছুই দেখল না সে। তারপর ফোকাস অ্যাডজাস্ট করতে দৃশ্যটা ফুটে উঠল চোখের সামনে।

কি এমন জরুরি কাজ পড়ল তোমার? এখনো রাগ যায়নি লেভিনের। অমন দামী একটা জিনিস।

ঠিক তখন রাতের অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে রক্তজল করা হিংস্র চিৎকারটা শুনল সবাই। খুব কাছ থেকে আসছে ভয়াল ডাকটা।

সংখ্যায় বারজন ওরা, গায়ের রঙ সবুজ, হায়েনার মতই মাংসলোভী আর ধূর্ত ডাইনোসারগুলো। র‍্যাপ্টর ওদের নাম। ডাইনোসরদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র প্রজাতি। ঘাস জমি পার হয়ে লেভিনের আস্তানার দিকে এগোচ্ছে দলটা। একটা জন্তু অন্যগুলোর থেকে কয়েকগজ সামনে, বোধহয় নেতৃত্ব দিচ্ছে। নেকড়ের মত গর্জন করছে সবাই, জিভ দিয়ে মুখে লেগে থাকা রক্ত চাটছে। কিছুক্ষণ আগে ওরাই হাওয়ার্ড কিংকে ছিঁড়ে খেয়েছে। হিংস্র প্রাণীগুলোকে এদিকে আসতে দেখে বুক হিম হয়ে গেল সবার।

এডি ফিসফিস করে বলল, ওরা এখানে আসবে নাতো?

জানি না ঠিক, লেভিনও জবাব দিল ফিসফিস করে।

মাটি থেকে আমরা বারো ফুট ওপরে আছি। হয়তো নিরাপদেই থাকব।

কিন্তু আপনি বলেছিলেন ওরা গাছে চড়তে পারে।

শ্‌শ্‌শ্‌। এটা গাছ নয়, বাড়ি। এখন সবাই শুয়ে পড়ো। আর একটি কথাও নয়।

সবাই হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকল মেঝের ওপর। এডি বাচ্চা দুটোকে জড়িয়ে ধরল। ছেলেটা সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে, মেয়েটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে ঠিকই আছে।

দেখতে দেখতে লেভিনের আস্তানার কাছে এসে পড়ল বিকট চেহারার প্রাণীগুলো। দলের নেতাটা মাচানের নিচে এসে দাঁড়াল। চাইল মুখ তুলে। ভীষণভাবে জ্বলে উঠল চোখ। লেভিনের দিকে তাকিয়ে বিকট ডাক ছাড়ল। তারপরই দিল প্রকাণ্ড লাফ। কিন্তু উঁচু মাচান পর্যন্ত পৌঁছুল না ওটার ধারাল, লম্বা নখ। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। নেতাকে লাফাতে দেখে বাকিগুলো এবার হামলা শুরু করে দিল। ওরা লাফিয়ে উঠছে, ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার নতুন উদ্যমে আক্রমণ চালাচ্ছে। ছোট্ট এই হাইড আউট কতক্ষণ ওদের নিরাপত্তা দিতে পারবে জানে না কেউ। ভয়ে শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল সবার।

এডি তার ন্যাপস্যাক খুলে একটা ফ্লেয়ার বের করে ছুঁড়ে মারল হিংস্র প্রাণীগুলোর দিকে। ফ্লেয়ারের উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে না পেরে দুটো র‍্যাপ্টর ছুটে পালাল। কিন্তু ওটা নিভে যেতে আবার দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে এল ওরা। এডি মেঝে থেকে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বার তুলে নিল, তারপর ওটাকে মুগুরের মত করে ধরে রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে নিচের দিকে ঝুঁকল।

একটা র‍্যাপ্টর ইতিমধ্যে লাফিয়ে মাচানের সমান উচ্চতায় উঠে গিয়েছিল। দাঁত খিঁচিয়ে ওটা তেড়ে এল এডিকে কামড়াতে এডিও উল্টো দাঁত খিঁচালো, ঝট করে মাথাটা সরিয়ে নিল পেছন দিকে, একটুর জন্য র‍্যাপ্টর মিস করল ওকে, কিন্তু দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল শার্ট। তারপর ঝুলতে লাগল রেলিংয়ের বাইরে। ওটার ওজনের চাপে এডি নুয়ে এল রেলিংয়ের ধারে।

চিৎকার করে উঠল সে বাঁচাও! বাঁচাও! বলে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে এডি, হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল লেভিন। কিন্তু এডির শার্ট কামড়ে ধরে শূন্যে ঝুলতেই থাকল র‍্যাপ্টর। এডি বারটা দিয়ে রাম ধাক্কা দিল ওটার নাকে। কিন্তু বুলডগের মত ওর শরীরের

সাথে প্রায় সেঁটে থাকল র‍্যাপ্টর। এডি আবার নুয়ে যেতে শুরু করল রেলিংয়ের ওপর, যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে।

মাংসাশী প্রাণীটার চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল এডি লম্বা মুগুর। ওকে ছেড়ে দিল র‍্যাপ্টর। লেভিনকে নিয়ে এডি ধপাস করে পড়ে গেল মেঝের ওপর। দাঁড়িয়ে দেখল র‍্যাপ্টরগুলো মাচানের কোনা বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। রেলিংয়ের কাছে আসতেই মুখে বাড়ি মেরে ওদের নিচে ফেলে দিল এডি।

জলদি! বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল এডি। ছাদে চলে যাও। জলদি!

দ্রুত ছাদে উঠতে শুরু করল কেলী, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল। আর্বি দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওকে ডাকল কেলী, চলে এসো আর্বি।

ভয়ে চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেছে আর্বির। নড়তে ভুলে গেছে বেমালুম। লেভিন দৌড়ে এল, ওকে শূন্যে তুলে ধরল। ছাদের দিকে কয়েকটা র‍্যাপ্টর দৌড়ে গিয়েছিল, এডি ওখানে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে লাফাতে থাকল যাতে একটা প্রাণীও উঠতে না পারে ওপরে।

কিন্তু একটা র‍্যাপ্টর ছাদের একটা কোনা কামড়ে ধরে জোরে ঝাঁকি দিল। ঝাঁকির চোটে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল এডি, দুলে উঠল শরীর, পড়ে যেতে শুরু করল ছাদ থেকে। না-আ-আ-আ! গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল তারা ধপাস করে পড়ে গেল নিচের ভেজা মাটিতে। সাথে সাথে সবগুলো র‍্যাপ্টর ঝাঁপিয়ে পড়ল এডির গায়ের ওপর। ছেঁকে ধরল মৌমাছির মত। র‍্যাপ্টরদের ভৌতিক ডাক ছাড়িয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল আক্রান্ত এডির রোমহর্ষক আর্তনাদ।

অমানুষিক চিৎকারটা শুনে লেভিনের গায়ের সব লোম দাঁড়িয়ে গেল। আর্বিকে এখনো জড়িয়ে ধরে আছে সে, এবার ছাদের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, যাও! যাও! যাও।

ছাদের ওপর থেকে কেলী বলতে লাগল, ভয় নেই, আর্বি। চলে এসো। তুমি পারবে।

ছাদের একটা কোনা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল আর্বি, ভয়ে পা কাঁপছে ঠকঠক করে। লেভিনের মুখে হঠাৎ জোরে লাথি লাগল। লেভিন ওর পা ছেড়ে দিল। পরক্ষণে একদিকে পিছলে গেল আর্বি, ডিগবাজি খেয়ে পড়তে শুরু করল মাটিতে।

ও খোদা! আর্তনাদ করে উঠল লেভিন। ও আমার খোদা!

আর্বির ভাগ্য ভাল সে গিয়ে পড়েছে এডি যেখানে পড়েছে, তার বিপরীত দিকে। ওখানে বিরাট একটা ধাতব খাঁচা ছিল। ঘাসের ওপর পড়েছে বলে আর্বি গায়ে বেশি ব্যথা পায়নি। সে পড়িমরি করে দৌড় দিল খাঁচা লক্ষ্য করে। চোখের পলকে ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজা। কিন্তু চাবিটা হাত বাড়িয়ে আনতে গিয়ে থেমে যেতে হল ওকে। তিনটে র‍্যাপ্টর ইতিমধ্যে নতুন শিকারের আশায় ছুটে এসেছে খাঁচার দিকে। কেলীকে খাঁচার বাইরে হাত বাড়াতে দেখে লাফ দিল ওকে লক্ষ্য করে। চট করে হাতটা ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল আর্বি। চিৎকার করে বলল, যা ভাগ! র‍্যাপ্টরগুলো এবার খাঁচা কামড়াতে শুরু করল, দাঁত বসিয়ে দিল ধাতব গরাদে। একটা র‍্যাপ্টরের নিচের চোয়ালে চাবির ইলাস্টিক ব্যান্ডটা গেল আটকে। র‍্যাপ্টরটা খাঁচা থেকে মাথা সরিয়ে টান দিল ইলাস্টিক ধরে। হঠাৎ তালা থেকে খুলে এল চাবি, ধাক্কা খেল ওটার ঘাড়ে।

র‍্যাপ্টর হতভম্ব হয়ে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে পিছিয়ে এল। ইলাস্টিকটা শক্তভাবে তার নিচের চোয়ালে আটকে গেছে, চাবিটা চাঁদের আলোতে ঝিকিয়ে উঠল। মাথা ঝাঁকিয়ে হাত দিয়ে অনেক চেষ্টা করল র‍্যাপ্টর ইলাস্টিকের গেড়োর হাত থেকে মুক্ত হতে, কিন্তু ওটা র‍্যাপ্টরের নিচের পাটির দাঁতের ফাঁকে এমন শক্তভাবে আটকে গেছে যে জোরাজুরির কারণে আরো মাংসের মধ্যে ঢুকে গেল। উপায় না দেখে অস্বস্তি নিয়ে মাটিয়ে মুখ ঘষতে লাগল র‍্যাপ্টর। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হল না।

এদিকে সুপারস্ট্রাকচার থেকে খাঁচাটাকে খসিয়ে ফেলেছে অন্য র‍্যাপ্টরগুলো, গরাদের গায়ে মুখ ঢুকিয়ে আর্বিকে কামড় দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। যখন বুঝল এতে কোনো ফায়দা হবে না তখন খাঁচাটার ওপর ইচ্ছেমতো লাথি আর গুঁতো দিতে শুরু করল ওরা। আরো কয়েকটা র‍্যাপ্টর এসে যোগ দিল আগেরগুলোর সাথে। এখন সাতটার একটা দল সামনে হামলা চালাতে লাগল খাঁচার ওপর। লেভিনের আস্তানার সামনে থেকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে খাঁচাশুদ্ধ আর্বিকে নিয়ে চলল র‍্যাপ্টররা। কেলী ছাদের ওপর থেকে আর্বিকে আর দেখতে পেল না। চারপাশ থেকে ঘিরে আছে ওরা খাঁচাটাকে।

এমন সময় কেলী হালকা একটা যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পেল, দূরে দেখা গেল দুটো হেডলাইটের আলো। একটা গাড়ি।

কে যেন আসছে।

কেলী দেখল র‍্যাপ্টরগুলো খাঁচাশুদ্ধ আর্বিকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে অনেক দূরে নিয়ে গেছে, শুধু দলছুট একটা পেছনে পড়ে আছে। এটা সেই র‍্যাপ্টরটা যেটার দাঁতের ফাঁকে চাবি ঝুলে আছে। র‍্যাপ্টরটা ঝামেলা মুক্ত হতে অনবরত মাথা ঝাঁকিয়ে চলেছে।

গাড়িটা কাছে আসতে হেডলাইডের আলোয় চোখ ঝলসে গেল র‍্যাপ্টরের। ডঃ থর্ন এসেছেন। তিনি গাড়িচাপা দেয়ার চেষ্টা করলেন ওটাকে। কিন্তু ঘুরে দৌড় দিল র‍্যাপ্টর সমতল ভূমির দিকে।

কেলী হাঁচড়ে পাঁচড়ে নামতে শুরু করল ছাদ বেয়ে।

থর্ন গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলতেই লেভিন লাফিয়ে উঠল, ওরা ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেছে, ট্রেইলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল সে।

কেলী দৌড়ে আসছে, চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়ান।

নিষেধ করলেন থর্ন, তুমি এখানেই থাকো। সারাহ্ আসছে। আর্বিকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমরা।

কিন্তু–

কথা বলার সময় নেই। বলে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন ডঃ থর্ন। গেম ট্রেইল ধরে পিছু নিলেন র‍্যাপ্টরদের। বিদ্যুৎ গতিতে ছুটতে শুরু করলেন। চারপাশে ঘন জঙ্গল। সামনের দিকে ট্রেইলটা ক্রমশ সরু হতে শুরু করেছে। থর্ন ঘটনাটা কি করে ঘটল জানতে চাইলেন। সংক্ষেপে তাঁকে ব্যাখ্যা করে শোনাল লেভিন। এডির ভাগ্যে কি ঘটেছে তাও বলল। মুখ অন্ধকার করে রাখলেন ডঃ থর্ন। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগছে, তারপরও দাঁতে দাঁত চেপে গাড়ি চালাতে লাগলেন তিনি। সামনে র‍্যাপ্টরগুলো খুব জোরে দৌড়াচ্ছে, অন্ধকারে ওদের অবয়ব ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ওরা আমাকে পাত্তাই দেয়নি, সারাহ্ এসে পৌঁছতে তাকে নালিশের সুরে বলল কেলী।

কি হয়েছে?

র‍্যাপ্টর চাবি নিয়ে গেছে। আর্বি খাঁচার মধ্যে বন্দী। চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে একটা র‍্যাপ্টর।

কোন্ দিকে গেছে?

ঐ দিকে, হাত তুলে সমতল ভূমির দিকে নির্দেশ করল কেলী। চাঁদের আলোয় ক্রমশ অপসৃয়মান র‍্যাপ্টরের কালো আকৃতি দেখা গেল পরিষ্কার।

আমাদের চাবিটা লাগবে আর্বিকে উদ্ধার করতে।

উঠে পড়ো, বলল সারাহ্, কাঁধ থেকে নামিয়ে আনল রাইফেল। কেলী সারাহ্র পেছনে, বাইকে চড়ে বসল। ওর হাতে অস্ত্রটা গুঁজে দিল সরাহ্।

গুলি চালাতে জান?

না, মানে কখনো–

বাইক চালাতে পারো?

না। আমি–

তাহলে তোমাকে গুলী চালাতে হবে, বলল সারাহ্। ভাল করে দেখ, এটা ট্রিগার। ঠিক আছে? সেফটি ক্যাচটা এই যে, এভাবে টানবে। বোঝা গেছে? তবে চলন্ত অবস্থায় গুলি করতে হবে। কাজেই টার্গেটের কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত ট্রিগার টানবে না।

কোন্ ট্রার্গেট?

সারাহ্ সম্ভবত কেলীর প্রশ্ন শুনতে পায়নি, সে বাইকে স্টার্ট দিয়ে ফেলেছে। বাঘের মত লাফ দিয়ে বাইক সামনে, ধাওয়া করল চাবি চোর র‍্যাপ্টারকে। কেলী খালি হাতটা দিয়ে জড়িয়ে ধরল সারাহ্কে পেছন থেকে।

ছাব্বিশ

ডঃ থর্নের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ের গায়ে দড়াম করে বাড়ি খেল। পাম গাছের পাতা চটাস শব্দে বাড়ি মারল উইন্ডশীল্ডে, ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, শুধু টের পাচ্ছে উতরাইয়ের ঢালের গভীরতা। জিপটা রাস্তার ধারে প্রায় উল্টে যাচ্ছিল, থর্ন শক্ত হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে ওটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। চিৎকার করে উঠেছিল রিচার্ড লেভিন ভয়ে। এখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। পাহাড় বেয়ে খাড়াভাবে নামতে শুরু করল জিপ। সামনে কালো কালো বিশাল বোল্ডার, ওগুলোর ওপর দিয়ে ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে র‍্যাপ্টরগুলো। বাঁদিকে গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে সরাসরি বোল্ডারের গায়ে ধাক্কা খেল ওরা। কাঁচ ভাঙার তীক্ষ্ম শব্দ হলো, গেছে একটা হেডলাইট। উল্টে যেতে যেতে আবার আরেকটা পাথরের সাথে সংঘর্ষ হলো জিপের। থর্ন ভাবলেন ট্রান্সমিশনের বুঝি বারটা বেজে গেছে, কিন্তু অলৌকিকভাবে ওটা কাত হয়ে বাঁ দিকে ছুটল। দ্বিতীয় হেডলাইটটা গুঁড়ো হয়ে গেল এক গাছের গোড়ায় বাড়ি খেয়ে। অন্ধকারের মধ্যেই চলতে থাকলেন ওরা। তারপর টের পেলেন নরম মাটির ওপর চলে এসেছে গাড়িটা।

গাড়ি থামালেন থর্ন।

চারদিকে সুনসান নীরবতা।

জানালা দিয়ে উঁকি দিল ওরা। বোঝার চেষ্টা করল কোথায় এসেছেন। কিন্তু অন্ধকার এত গাঢ় যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত কোনো গিরিখাতের তলায় এসে পড়েছ ওরা। মাথার ওপর গাছের সামিয়ানা।

ওটা বোধহয় কোনো স্ট্রীমবেড, বলল লেভিন।

ভাল করে নজর বুলিয়ে থর্ন দেখলেন লেভিনের কথাই ঠিক। স্ট্রীমবেডের মাঝখান দিয়ে র‍্যাপ্টরগুলো দৌড়ে পালাচ্ছে। দু'ধারে বড় বড় পাথরের বোল্ডার, তবে শুকনো নদীটা বেশ চওড়া, গাড়ি নিয়ে দিব্যি যাওয়া যাবে। তিনি র‍্যাপ্টরগুলোকে আবার ধাওয়া শুরু করলেন।

স্ট্রীমবেড ক্রমশ চওড়া হয়ে উঠল, সমতল একটা বেসিনে চলে এলেন ওরা। বোল্ডারের চিহ্ন নেই এদিকে, নদীর দুই তীরে গাছ দেখা যাচ্ছে। তবে র‍্যাপ্টরদের নিশানাও নেই কোথাও। গাড়ি থামালেন থর্ন, জানালার কাঁচ নামিয়ে কান পাতলেন। হিসহিস আর গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা গেল। বাঁদিক থেকে আসছে যেন শব্দটা।

ও দিকে গাড়ি ঘোরালেন থর্ন, ফার্ন আর পাইন গাছের মাঝখানের রাস্তা ধরে যেতে লাগলেন, ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে একটা ফাঁকা মত জায়গায় এসে হাজির হলেন। চওড়া উঠোনে অ্যাপাটোসারদের বিশাল কংকাল দেখতে পেলেন ওরা। কংকালের বুকের খাঁচা, ম্লান হাড়ের বক্ররেখা সবই পরিষ্কার দেখা গেল চাঁদের আলোতে। একটা আধ খাওয়া লাশ পড়ে আছে উঠোনের মাঝখানে, মাছি ভনভন করছে। এডির লাশ।

র‍্যাপ্টরগুলো এডির শরীরের অবশিষ্ট অংশ কে কার আগে খাবে তাই নিয়ে মারামারি শুরু করে দিয়েছে। ফাঁকা জায়গাটার বিপরীত দিকে তিনটে নিচু মাটির টিলায় বেশ কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে দালান। ফাঁক ফোকর দিয়ে ডিমের খোসা দেখা যাচ্ছে। বাতাসে কটু গন্ধ।

লেভিন ওদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, আমরা র‍্যাপ্টরদের আস্তানায় চলে এসেছি।

খাঁচাটাকেও দেখা গেল, উঠোনের শেষপ্রান্তে মাটির ওপর পড়ে আছে, অর্ধেকটা ঢেকে আছে লতা-পাতায়। খাঁচা ছেড়ে র‍্যাপ্টারগুলো এডির লাশ নিয়ে কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত। থর্ন একটা লিওস্ট্রাডট রাইফেল হাতে নিলেন, খুললেন কার্ট্রিজ প্যাক। দুটো গুলি আছে। প্রয়োজনের তুলনায় কম, বলে বন্ধ করে ফেললেন প্যাক। এখানে দশটা র‍্যাপ্টর আছে।

লেভিন তার ন্যাপস্যাক খুলে ছোট একটা রুপালী রঙের সিলিন্ডার বের করল, আকারে বড়, সফটড্রিংকের বোতলের মত। সিলিন্ডারের নিচে লেখা (CAUTION TOXIC METACHOLINE (MIVACURIUM)

কি জিনিস? জানতে চাইলেন থর্ন।

এক ধরনের অ্যারোসল, বলল লেভিন, মিনিট তিনেকের জন্য বন্ধ করে দেয় জীবন প্রবাহ। র‍্যাপ্টরগুলোকে কজা করার মহৌষধ।

কিন্তু ছেলেটার কি হবে? বললেন থর্ন, ওটা ব্যবহার করা চলবে না। আর্বিও তাহলে প্যারালাইজড হয়ে যাবে।

লেভিন হাত উঁচিয়ে দেখাল, খাঁচার ডান দিকে কানেস্তারটা ছুঁড়ে মারলে আর্বির গায়ে গ্যাস লাগবে না, আক্রান্ত হবে র‍্যাপ্টরগুলো।

যা ভাবছ তা নাও হতে পারে, বললেন থর্ন। ও সাংঘাতিক আহত হতে পারে।

লেভিন মাথা ঝাঁকাল। সিলিন্ডারটা রেখে দিল ন্যাপস্যাকে। র‍্যাপ্টরগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে এখন উপায়?

আমি যাচ্ছি ওকে উদ্ধার করে আনতে।

কিভাবে?

দেখ কিভাবে।

লেভিনের হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং গছিয়ে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে জিপের পেছন দিকে চলে এলেন থর্ন। তারপর বললেন, গো!।

লাফ দিয়ে উঠল জিপ। বিদ্যুৎ গতিতে এগোল ফাঁকা উঠোনের দিকে। লাশ নিয়ে ব্যস্ত র‍্যাপ্টরগুলো আকস্মিক এই অনুপ্রবেশকারীদের আগমনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। কিন্তু ওরা কিছু করার আগেই লেভিন গাড়ি নিয়ে চলে এল আর্বির খাঁচার কাছে। লাফ দিয়ে খাঁচাটাকে দুই হাতে জাপটে ধরলেন থর্ন। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না ছেলেটার আঘাত কতখানি গুরুতর; আর্বি উপুড় হয়ে আছে খাঁচার মধ্যে। খাঁচাটা প্রচণ্ড ভারী, জিপে তুলতে জান বেরিয়ে গেল থর্নের। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে র‍্যাপ্টরগুলো এবার অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে দৌড়াতে শুরু করল গাড়ির পেছন পেছন। এর মধ্যে যে র‍্যাপ্টরটা অন্যদের চেয়ে এগিয়ে ছিল দৌড়ে, সে লাফ দিল শূন্যে, পড়ল এসে গাড়ির পেছন দিকে, ক্যানভাসের টারপুলিন কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে। হিসহিস শব্দ করতে লাগল, টারপুলিন ধরে ঝুলেই থাকল।

র‍্যাপ্টরদের আস্তানা ছেড়ে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে এল লেভিন। প্রবল ঝাঁকুনি খেতে শুরু করল জিপ, অথচ গাড়ির পেছনে ঝুলে থাকা র‍্যাপ্টরটার কিছুই হল না। বরং টারপুলিন ছেড়ে ওটা এবার দাঁত বসিয়ে দিল খাঁচায়। গাড়ি থেকে খাঁচাকে ফেলে দেয়ার জন্য টানাটানি শুরু করল। থর্ন আরেক দিক থেকে ধরে ফেললেন খাঁচা। রীতিমত টাগ অব ওয়ার শুরু হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। কিন্তু র‍্যাপ্টরটার শক্তি বেশি। টানাটানিতে সে জিততে শুরু করল।

এটা ধরুন! লেভিন চিৎকার করে বলল, একটা বন্দুক এগিয়ে দিল থর্নের দিকে। থর্ন চিৎ হয়ে দু'হাত দিয়ে ধরে আছেন খাঁচা, বন্দুক ধরবেন কিভাবে? লেভিন ফিরে দেখল নাজুক অবস্থাটা। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখল সে। র‍্যাপ্টারদের গোটা দল হাঁ করে ছুটে আসছে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। এখন গাড়ির গতি কমানোর প্রশ্নই ওঠে না। ফুল স্পীডে গাড়ি চালাতে চালাতেই লেভিন ঘুরল প্যাসেঞ্জার সীটের দিকে, লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করল। বুক কাঁপছে ওর। জানে না গুলি থর্ন বা আর্বির গায়ে লাগবে কি না।

সাবধান! চিৎকার করে বললেন থর্ন। সাবধান।

লেভিন কোনমতে সেফটি অফ করল, ব্যারেলটা সোজা তুলে ধরল র‍্যাপ্টরটার দিকে, ওটা এখনো কামড়ে ধরে আছে খাঁচা। প্রাণীটা মুখ তুলে চাইল, অত্যন্ত দ্রুত নড়ে উঠল শরীর, কামড়ে ধরেছে ব্যারেল। টান মারল বন্দুক।

গুলি করল লেভিন।

বিষাক্ত সূঁচটা সটান গলায় ঢুকে যেতে বিস্ফোরিত হয়ে উঠল র‍্যাপ্টরের চোখ। ঘড়ঘড়

একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল মুখ থেকে, খিঁচুনি শুরু হলো শরীরে, তারপর গাড়ির ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যেতে লাগল। পড়ার সময় লেভিনের হাত থেকে এক ঝটকায় বন্দুকটাও টেনে নিয়ে গেল।

থর্ন হাঁটুতে ভর করে উঠে বসলেন, খাঁচাটাকে নিয়ে এলেন গাড়ির ভেতরে। পেছন ফিরে দেখলেন র‍্যাপ্টরগুলো এখনো তাদের পিছু ছাড়েনি, তবে কমপক্ষে বিশ গজ দূরে রয়েছে ওগুলো ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

ড্যাশবোর্ডে রেডিও কড়কড় করে উঠল। ডক্টর সারাহ্‌র গলা।

হ্যাঁ বলো, সারাহ্‌।

আমরা র‍্যাপ্টরটাকে মেরেছি। খাঁচার চাবি এখন আমাদের হাতে। আর্বির কি অবস্থা?

ওকে উদ্ধার করতে পেরেছি।

থ্যাঙ্ক গড। কেমন আছে ও?

জানি না। তবে বেঁচে আছে।

আপনারা কোন্‌দিকে যাচ্ছেন?

ট্রেলারে, রিজ রোডে ফিরে যাচ্ছি।

ঠিক আছে, বলল সারাহ্‌। আমরাও আসছি ওখানে।

সাতাশ

কিন্তু রিজ রোডে এসে আবার আতংকের মুখোমুখি হলেন থর্ন এবং লেভিন। ওখানে আগে থেকেই ঘাপটি মেরে ছিল কয়েকটা হিংস্র র‍্যাপ্টর। রাস্তা আটকে রেখেছে। আর যেখানে তারা পৌঁছেছে সেখান থেকে ট্রেলারের দূরত্ব আরো আধা মাইল। গাড়ি ঘুরিয়ে তারা পালাতে গেল, কিন্তু তার আগেই আক্রান্ত হলো। একটা র‍্যাপ্টর প্রকাণ্ড লাফ মেরে চড়ে বসল জিপের ওপর, ধারাল নখ আর দাঁত দিয়ে ফালাফালা করে ফেলল ক্যানভাসের হুড। আরেকটা র‍্যাপ্টর ঝাঁপিয়ে পড়ল উইনডশীল্ডের ওপর, চুরমার করে দিল কাঁচ। কিন্তু গাড়ির ঝাঁকুনিতে ওটা ছিটকে পড়ল মাটিতে। তবে ভয়ানক আগ্রাসী হয়ে উঠল জিপের ওপরের র‍্যাপ্টরটা। লেভিন ওটাকে ছুরি দিয়ে মারতে গেল, উল্টো ধারাল থাবার আঘাতে নিজের হাতের মাংস উড়ে গেল। গাড়ি থামানোর উপায় নেই। কারণ গাড়ির পেছন পেছন যমদূতের মতো ছুটে আসছে দুটো র‍্যাপ্টর। র‍্যাপ্টরটার সাথে লড়াই করে ক্লান্ত লেভিন যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, ওটা তার গলায় মরণ কামড় বসাতে যাচ্ছে, এমন সময় ওখানে দেবদূতের মত হাজির হয়ে গেল কেলী এবং সারাহ্‌ হার্ডিং। লিনডস্ট্রাডট রাইফেলের বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে মাংসাশী প্রাণীটাকে মুহূর্তের মধ্যে মাটিতে শুইয়ে দিল। থর্ন গাড়ির গতি কমালে সে লেভিনের হাতে একটা চাবি গুঁজে দিল। বলল, খাঁচা খোলার জন্য। তারপর আবার মোটর সাইকেলে ঝড়ের গতি তুলল সারাহ্‌। থর্ন আতংকিত হয়ে আবিষ্কার করলেন জিপের ইঞ্জিন খক খক করে কাশতে শুরু করেছে, ফুরিয়ে এসেছে গ্যাস। র‍্যাপ্টরগুলো তখনো তাদের পিছু ছাড়েনি। কাজেই এখন গাড়ি থামানো মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে ডেকে আনা। ট্রেলারে পৌঁছার আশা ছেড়ে দিল থর্ন এবং লেভিন। কারণ ট্রেলারটাকে বাঁদিকে দেখা গেলেও ওটাকে

বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে রাস্তার মাঝে খাড়া একটা ঢাল। ওখানে যেতে হলে অনেকখানি পথ ঘুরতে হবে। আর সামনে, রাস্তাটা যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে তার ডানদিকে ঢাল নেমে গেছে ল্যাবরেটরীর দিকে। অনন্যোপায় হয়ে ল্যাবরেটরীর দিকেই গাড়িটা ছোটালেন থর্ন। হাতের ডানে, ফুটফুটে চাঁদের আলোয় ম্যানেজারের ঘর, এবং গ্যাসপাম্পসহ স্টোর চোখে পড়ল তাঁর। ওখানে গ্যাসোলিন পেয়ে যাবার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

ঐ যে দেখুন! দেখুন! লেভিন পেছনে ইঙ্গিত করে বলল। থর্ন মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন র‍্যাপ্টরগুলো ফিরে যাচ্ছে।

ওরা আর আমাদের ধাওয়া করছে না, বলল লেভিন।

হু, বললেন থর্ন। কিন্তু সারাহ্ কোথায় গেল?

তাদের পেছনে, সারাহ্‌র মোটর সাইকেলের কোন পাত্তাই নেই।

আঠাশ

ডঃ থর্ন এবং রিচার্ড লেভিন স্টোরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে ওখানে এসে হাজির হলো সারাহ্ হার্ডিং। সাথে কেলী এবং আয়ান ম্যালকম। রেডিওতে আগেই যোগাযোগ করেছিল বলে এখানে আসতে সমস্যা হয়নি কোনো। সারাহ্‌র চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন বোধ করলেন ডঃ থর্ন। বোঝাই যায় ঝড় বয়ে গেছে মেয়েটার ওপর। ক্লান্ত সারাহ্ দম নিয়ে সংক্ষেপে যে রোমহর্ষক গল্পটা ওদেরকে বলল তার সারাংশ হলো–র‍্যাপ্টরদের তাড়া খেয়েও সারাহ্ কেলীকে নিয়ে ট্রেলারের উদ্দেশে ছুটছিল। ম্যালকম সাংঘাতিক অসুস্থ, নড়াচড়া দূরে থাক, কথাই বলতে পারে না ঠিকমত। কিন্তু ট্রেলার থেকে ওকে নিয়ে আসা সারাহ্‌র জন্য ছিল রীতিমত ঝুঁকির ব্যাপার। ট্রেলারে সারাহ্ এবং কেলী ঢুকে যাবার পরে তাজা মাংস আর রক্তের লোভে উম্মাদ হয়ে ওঠে প্রাণীগুলো। ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দিতে থাকে ট্রেলারের বাইরের ধাতব কাঠামো। এমনকি সারাহ্‌র মোটর সাইকেলটাকে পর্যন্ত ওরা আঁচড়ে কামড়ে কিছু রাখেনি। ভয়ানক এই বিপদের সময় প্রায় পঙ্গু ম্যালকম ওদের কোনো সাহায্যেই আসছিল না। শেষে গ্যাস বোমা ছুঁড়ে র‍্যাপ্টরগুলোকে অজ্ঞান করে ফেলে সারাহ্। অতবড় জোয়ান মর্দ আয়ান ম্যালকমকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসে মোটর সাইকেলে। তারপর কেলীকে নিয়ে চলে আসে সে এখানে। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার, ওরা বাইকে ওঠার সময় র‍্যাপ্টরদের একটার জ্ঞান ফিরে আসছিল। আরেকটু দেরী হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত।

এক নিশ্বাসে গল্পটা বলে স্টোরের চারপাশে চোখ বুলাতে লাগল সারাহ্ হার্ডিং।

রাস্তার ধারের পরিত্যক্ত মুদি দোকানের মতই স্টোরটা। সফট ড্রিংকের জন্য গ্লাস-ওয়ালড রেফ্রিজারেটর, ক্যানগুলো বাঁকাত্যাড়া হয়ে গ্লাসের আকৃতি নিয়েছে। হাতের কাছের একটা তারের র‍্যাকে ক্যান্ডিবার, সবুজ রঙের রাংতার ওপর কিলবিল করছে পোকা। পত্রিকার র‍্যাকের পত্রিকাগুলো ধুলিধূসরিত, মলিন। একদিকের রো-তে আছে টুথপেস্ট, অ্যাসপিরিন, সানট্যান লোশন, শ্যাম্পু, চিরুনী, ব্রাশ ইত্যাদি হাবিজাবি। এছাড়াও অন্যান্য র‍্যাকগুলোতে কাপড় চোপড় চোখে পড়ল, টি শার্ট, শর্টস, মোজা, বাথিং স্যুটস আরো কত কি। এছাড়া চাবির রিং, অ্যাসট্রে, মদের গ্লাস ইত্যাদ সুভেনিরও রয়েছে।

ঘরের মাঝখানে অল্প জায়গা জুড়ে আছে একটা কম্পিউটার ক্যাশ রেজিস্টার, একটা মাইক্রোওয়েভ এবং একটা কফি তৈরির যন্ত্র। মাইক্রোওয়েভের দরজাটা খোলা, ওখানে বাসা তৈরি করেছে দু'একটা প্রাণী। কফি তৈরির যন্ত্রটা ভাঙ্গা, ঢেকে আছে মাকড়সার জালে।

কি জঘন্য অবস্থা! মন্তব্য করল ম্যালকম।

আমার কিন্তু ভালই লাগছে, বলল সারাহ্। জানালাগুলোর অবস্থা যাচ্ছেতাই। তবে দেয়ালটা শক্ত পাথরের মনে হচ্ছে। রেস্টরুম লেখা একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল সারাহ্র। সব মিলে ঘরটা নিরাপদ মনে হল ওর কাছে।

ম্যালকমকে মেঝেতে শুতে সাহায্য করল সারাহ্। তারপর থর্ন আর লেভিনের কাছে গেল। ওরা আর্বির সেবা করছেন। আমি ফার্স্ট এইড কিটটা নিয়ে এসেছি। বলল সারাহ্। কেমন আছে ও?

শরীরে ছাল চামড়া বলে কিছু নেই, বললেন থর্ন। তবে হাড়টাড় ভাঙেনি। মাথায়ও ব্যথা পেয়েছে।

আমার সারা শরীর ব্যথা করছে, বলল আর্বি, এমকি মুখও।

সারাহ্ আর্বির মুখের ভেতরটা দেখল ভাল করে, বলল, কয়েকটা দাঁত ভেঙেছে আর্বি। ও কিছু নয়। ঠিক হয়ে যাবে। আর তোমার মাথার ক্ষতটাও মারাত্মক কিছু নয়। গজ দিয়ে ক্ষত পরিষ্কার করে দিল সারাহ্। তারপর ঘুরল থর্নের দিকে, হেলিকপ্টার আসতে আর কত দেরী?

যে হেলিকপ্টারটা থর্নদের এই দ্বীপে পৌঁছে দিয়েছিল ওটার আজ আবার আসার কথা অভিযাত্রীদের তুলে নিয়ে যেতে।

থর্ন ঘড়ির দিকে তাকালেন, আর ঘন্টা দুই।

কোথায় ল্যান্ড করবে ওটা?

হেলিপ্যাড আছে একটা। এখান থেকে অনেক দূরে।

আর্বির শুশ্রূষা করতে করতে মাথা ঝাঁকাল সারাহ্। তার মানে দু'ঘণ্টা সময় পাচ্ছি আমরা হেলিপ্যাডে পৌঁছতে।

কেলী বলল, কিন্তু যাব কি করে? গাড়িতে তো গ্যাস নেই।

চিন্তা করো না, ওকে অভয় দিল সারাহ্। উপায় একটা হয়ে যাবেই।

সে তো আপনি সবসময়ই বলেন, বলল কেলী।

কারণ সবসময় উপায় একটা বের হয়েই যায়। বলে হাসল সারাহ্ হার্ডিং।

উনত্রিশ

গ্যাস না হলে গাড়ি চলবে না, আর গাড়ি না চললে হেলিপ্যাডে পৌঁছানোর আশা দুরাশা মাত্র। তাই ডঃ থর্ন নিজেই অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন গ্যাসের খোঁজে। তাঁর ধারণা স্টোরের গ্যাস পাম্পগুলোর কোন একটাতে আসল জিনিসের খোঁজ পাওয়া যাবেই।

ডঃ থর্ন বেরোবার পরে অনেক সময় গেল, তারপরও তিনি ফিরলেন না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল অন্যরা। ভয়ও পেল কারণ স্টোরের বাইরে ভয়াবহ চেহারার দুটো প্রাণী হাঁটাহাঁটি

শুরু করেছে। তিন মিটার লম্বা গিরগিটি চেহারার ডাইনোসরগুলোকে দেখেই চিনতে পারল লেভিন। এগুলোই তার গাইড ডিয়েগোকে হামলা করেছিল। মাংসাশী প্রাণীগুলো সাংঘাতিক হিংস্র স্বভাবের। কোনোটারই ওজন পাঁচশ পাউন্ডের নিচে নয়। বুলডগের মত মুখ চোখের ওপরে জোড়া শিং। সাক্ষাৎ নরকের শয়তান। লেভিন হঠাৎ ফ্লাশ লাইটের আলো ফেলতে ওগুলো দারুণ চমকে উঠল। পিছিয়ে গেল ঘরের সামনে থেকে। আলো নিভলে কাছে চলে এল। সারাহ্ লেভিনকে আলো জ্বালিয়ে রাখতে বলল। ফল হলো দারুণ। প্রখর আলো সহ্য করতে না পেরে প্রাণী দুটো ক্রমশ পিছু হঠতে শুরু করল। হঠাৎ কোত্থেকে স্টোরের সামনে টেনিস কোর্ট পার হয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন ডঃ থর্ন। তাঁকে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সবাই।

থর্ন বললেন তিনি গ্যাস পাম্প, ড্রাম ইত্যাদি যা পেয়েছেন সব পরীক্ষা করে দেখেছেন। কিন্তু গ্যাস পাননি। তাঁর কথা শুনে হতাশ হয়ে পড়ল অন্যান্যরা। এখান থেকে উদ্ধারের কি তাহলে কোনো আশাই নেই। সবাই যখন শত ভেবেও কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না তখন সারাহ্ বলল, উপায় কিন্তু একটা আছে?

কি উপায়? জিজ্ঞেস করলেন থর্ন।

ট্রেলারের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এক্সপ্লোরার-এর কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি কেন? ওতে তো গ্যাসের ট্যাংক আছে।

এক্সপ্লোরার-এর আশা ছেড়ে দাও সারাহ্, বললেন থর্ন। ওটা ইলেকট্রিক কার। আর সার্কিট ব্রেকার ভেঙ্গে গেছে এক্সপ্লোরার-এর। কাজেই ওটার সাথে এখন লাশের কোনো পার্থক্য নেই।

যদি ব্রেকার আবার লাগানো যায় তাহলে চলবে না গাড়ি?

তা অবশ্য চলবে। কিন্তু ...

আর কিন্তু নয়। এটাই এখন আমাদের একমাত্র চান্স। রেডিও হেডসেটটা টেনে নিল সারাহ্, থুতনিতে বাঁধল মাইক্রোফোন, তারপর মোটর সাইকেলটাকে নিয়ে এলো দরজার কাছে। তাকাল বাইরে। ভোর হয়ে আসছে। সেই বিকট চেহারার ডাইনোসর দুটো ভেগেছে অনেক আগেই। মোটর সাইকেলে চড়ে বসল সারাহ্। আমি রেডিওতে যোগাযোগ রাখব, বলল সে। এখন গেলাম গাড়ির সন্ধানে।

সারাহ্ যাবার কিছুক্ষণ পরে বেজে উঠল রেডিও। থর্ন মাইক তুলে নিলেন দ্রুত। বলো, সারাহ্!

আমি পাহাড়ের কাছে চলে এসেছি ডক্টর। ওদেরকে দেখতে পাচ্ছি, দুজনের একটা দল।

র‍্যাপ্টর?

হ্যাঁ ওরা, আ.. শুনুন, আমি অন্য আরেকটা পথ ধরে যাবার চেষ্টা করছি। দেখছি একটা—

রেডিও খড়খড় করে উঠল।

সারাহ্?

'— একটা গেম ট্রেইলের মতো এখানে আমার মনে হয়——'

সারাহ্, বললেন থর্ন। তোমার কথা বোঝা যাচ্ছে না,

দোয়া করবেন----।

রেডিওতে বাইকের ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। তারপর ওরা আরেকটা শব্দ শুনতে পেল, প্রাণীর গর্জন। শব্দটা অনেকক্ষণ স্থায়ী হলো। থর্ন কানের কাছে চেপে ধরলেন রেডিও। কিন্তু বারবার ডেকেও সারাহ্‌র কাছে থেকে কোনো জবাব এল না।

সময় বয়ে চলল ধীর গতিতে। লেভিন জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। ঘরের এক কোণে নাক ডাকছে কেলী। আর্বি ম্যালকমের পাশে গভীর ঘুমে অচেতন। ম্যালকম বেসুরো গলায় গান গাইছে।

থর্ন বসে আছেন রুমের মাঝখানে, মেঝের ওপর চেক আউট কাউন্টারে হেলান দিয়ে। একটু পরপর রেডিওতে সারাহ্‌র সাথে যোগাযোগের নিষ্ফল চেষ্টা করছেন তিনি। শেষে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন।

হঠাৎ বেজে উঠল রেডিও। যন্ত্রটা খামচে ধরলেন থর্ন। সারাহ্? সারাহ্?

যাক অবশেষে পেলাম, খনখনে শোনাচ্ছে সারাহ্‌র কণ্ঠ, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ডক্টর।

তুমি ঠিক আছ তো?

অবশ্যই ঠিক আছি। আমি গাড়ির কাছে বলে এসেছি। তবে একটা কথা লেভিনকে একটু জিজ্ঞেস করুন তো চারফুট লম্বা ডাইনোসর, কপালটা গম্বুজের মতো, গায়ের রং সবুজ, এরা বিপজ্জনক কি না।

লেভিন মাথা দোলাল। ওকে বলুন হ্যাঁ। ওদের নাম প্যাকুসেফালোসারস।

লেভিন বলেছে হ্যাঁ, বললেন থর্ন। ওগুলোর নাম প্যাকুসেফালো না কি যেন। তোমাকে সাবধানে থাকতে বলল। কেন, কি হয়েছে?

কারণ ওরকম বদখত চেহারার গোটা পঞ্চাশেক প্রাণী ঘিরে রেখেছে আমাদের গাড়ি।

ত্রিশ

শরীরে প্রচন্ড ব্যথা নিয়ে জেগে উঠল ডজসন। এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছিল সে। ডজসন ঘুমিয়ে ছিল গার্ড হাউজের মেঝের ওপর। টাইরানোসারের তাড়া খেয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে। জ্ঞান ফিরে দেখে তিনঠেঙ্গা, মুরগীর মত কতগুলো সবুজ ডাইনোসর ওকে চারদিকে থেকে ঘিরে রেখেছে। ওগুলো ছিল কম্পি, শকুনের মত লাশ খেতে পটু। ডজসনকে লাশ ভেবেই ঠোকর শুরু করেছিল খুদে ডাইনোসারগুলো। কিন্তু ওকে জাগতে দেখে কম্পিগুলো দূরে সরে যায়। পরে আবার তাড়া করে ডজসনকে। দৌড়াতে দৌড়াতে ডজসন এই গার্ড হাউসে ঢুকে পড়ে। দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে দেয়। কম্পিরা আর ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায়নি। প্রচুর রক্তক্ষরণে এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ডজসন, তার ওপর আবার সাময়িক এই উত্তেজনা ওকে আরো দুর্বল করে তুলেছিল। মেঝেতে শরীর এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। আর এখন ঘুম থেকে জেগেছে সে প্রবল আড়ষ্ট শরীর নিয়ে।

উঠে দাঁড়াল ডজসন, জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। ম্লান নীল আকাশের গায়ে লালচে রেখা। ভোর হচ্ছে। সে দরজা খুলে পা রাখল মাটিতে।

কম্পিগুলোর পাত্তা নেই। খুব তেষ্টা পাচ্ছে ডজসনের। হেঁটে কতগুলো গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। চারপাশে জঙ্গল। ভোরের প্রথম প্রহরে আশ্চর্য নিস্তব্ধ চারদিক। এখন একটু জল খেতে না পেলে বুক ফেটে মরেই যাবে ডজসন। বাঁ দিকে কোথায় যেন কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে নদী। ওদিকে দ্রুত পা বাড়াল সে।

গাছের আড়ালের ফাঁক ফোকর দিয়ে টুকরো আকাশ নজরে পড়ে। ডজসন জানে ম্যালকমের লোকজন এ দ্বীপেই আছে। ওরা নিশ্চয়ই দ্বীপ ছেড়ে পালানোর মতলব করেছে। ওরা যদি যেতে পারে ম্যালকম ও নিশ্চয়ই পারবে।

একটা পাথুরে টিলার কাছে চলে এল ডজসন, ওটার নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে জলধারা। ঝকঝকে জল। দূষিত কিনা কে জানে। অবশ্য এখন ও সব পরীক্ষা করার সময় নেই। ঝর্নার কাছে মাত্র পৌঁছেছে ডজসন, এমন সময় একটা লতায় পা বেঁধে পড়ে গেল সে। বিশ্রী গালি দিয়ে উঠল ডজসন।

উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরল সে। না, লতা নয়, একটা সবুজ ব্যাকপ্যাকের স্ট্রাপে আছাড় খেয়েছে সে।

ডজসন শতচ্ছিন্ন ব্যাকপ্যাকটা খুলে ফেলল। একটা ক্যামেরা, খাবারের মেটাল কেস, একটা প্লাস্টিকের জলের বোতল এবং একটা রেডিও। কেস খুলে কোনো খাবার পেল না ডজসন, ফোম ছাড়া। বিরক্ত হয়ে রেডিওর সুইচ অন করল সে। ব্যাটারীর লাইট জ্বলে উঠল।

ভেসে এল একটা পুরুষ কণ্ঠ 'সারাহ্? আমি থর্ন বলছি, সারাহ্?

এক মুহূর্ত পর নারী কণ্ঠ শোনা গেল, ডক্টর, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আমি বলেছিলাম আমি এখন আমাদের গাড়িটার কাছে আছি।

রেডিওতে ওদের আলাপ শুনছে মনোযোগ দিয়ে। এক টুকরো ভয়াল হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। এখানে তাহলে একটা গাড়িও আছে!

একত্রিশ

রাস্তার মাঝখানে, গাছ-গাছালিতে ঘেরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এক্সপ্লোরার। ওটার চারপাশে অনেকগুলো প্যাকিসেফালোসারস। দীর্ঘদিন অরণ্যে ঘোরার অভিজ্ঞতা থেকে সারাহ্ হার্ডিং জানে প্রাণীগুলোর কতটা কাছে তার যাওয়া উচিত। ওগুলো যদি ওয়াইল্ড বীস্ট হতো, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সোজা হেঁটে ওদের মাঝ দিয়ে পথ করে চলে যেতো সে। ওরা যদি আমেরিকান বাফেলো হতো তাহলে সতর্ক হতো সারাহ্, তবু যেত। কিন্তু আফ্রিকান বাফেলো হলে ধারে কাছেও ঘেঁষতো না।

থুতনির সাথে লাগানো মাইক্রোফোনের বোতাম টিপে দিল সারাহ্। হেলিকপ্টার এসে পৌঁছতে আর কত দেরী?

বিশ মিনিট।

তাহলে আর সময় নেই। বলল সে। কিন্তু যাব কিভাবে?

এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর থর্ন রেডিওতে বললেন, ধীরে হেঁটে যাবার চেষ্টা করে দেখতে পার, দেখ ওরা তোমাকে যেতে দেয় কি না। তবে দৌড়ানোর চেষ্টা করবে না।

প্রাণীগুলোর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সারাহ্ ভাবল, ওরা বললেই তো আর আমাকে পথ ছেড়ে দেবে না।

না, ধন্যবাদ। বলল সে। আমি একটু অন্য চেষ্টা করতে চাই।

মাইক্রোফোন অফ করে দিয়ে একটা গাছে চড়তে শুরু করল সারাহ্ হার্ডিং। ডালগুলো বেশ নরম। ওর ওজন বইতে পারবে কি না সন্দেহ। উঁচু একটা ডালে চড়ে বসল সারাহ্। গাড়িটা হাত দশেক নিচে। কয়েকটা ডাইনোসার মুখ তুলে সারাহ্র দিকে চাইল। দলটার বেশীরভাগ কাদামাটিতে বসেছিল, এবার উঠে দাঁড়াল। সারাহ্ যে গাছে উঠেছে ওটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল। উত্তেজিত ভঙ্গিতে লেজ নাড়ছে সবক'টা।

সারাহ্ যে ডালটাতে বসেছে, আগের দিন বৃষ্টি হবার কারণে ওটা এখনো বেশ পেছল। গাড়ির ছাদে লাফিয়ে পড়ার জন্য ডালটাতে জুৎসইমত বসতে যাচ্ছে সারাহ্, এই সময় প্রবল এক ধাক্কায় গাছশুদ্ধ কেঁপে উঠল সে। গাছের গোড়ায় একটা ডাইনোসার গুঁতো মেরেছে সজোরে।

ধাক্কার চোটে এত জোরে ডালপালাগুলো নড়ে উঠল যে হাত ফস্কে গেল সারাহ্র। মুঠো করে ধরতে চাইল সে আবার। কিন্তু ভেজা পাতা আর ছাল সড়সড় করে সরে গেল হাতের তলা দিয়ে। ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে উড়াল দিল সারাহ্। শেষ মুহূর্তে দেখল গাড়ির কাছ থেকে দূরে সরে গেছে সে, দড়াম করে কাদা মাটিতে আছাড় খেল সারাহ্।

ডাইনোসারগুলোর ঠিক পাশে।

ব্যথার চোটে শরীরের সমস্ত হাড় ঝিনঝিন করে উঠল। কিন্তু আহা উহু করার সময় পেল না সারাহ্। ওর দিকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে প্রাণীগুলোকে ছুটে আসতে দেখে দ্রুত সে এক্সপ্লোরার-এর তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল।

তারপর রেডিওতে ডঃ থর্নের সাথে যোগাযোগ করে নিজের অবস্থার কথা জানাল। থর্ন বললেন, ওখান থেকেই তুমি ব্রেকারটা চেক করতে পারবে। এখন যা যা বলি শোনো।

রেডিওতে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে গেলেন ডঃ থর্ন, পরামর্শ মত কাজ করে গেল সারাহ্। কিছুক্ষণ পর গুনগুন গুঞ্জন করে উঠল ইঞ্জিন। ডক্টরকে সে কথা জানাতে তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন, বাহ্! এইতো গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে।

এখন আমি কি করব?

কিছু না। চুপচাপ শুয়ে থাকো।

হেলিকপ্টার আসতে আর কতক্ষণ বাকি?

দশ মিনিট।

কিন্তু কি করে নড়ব ডক্টর। শয়তানগুলো চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে আমাকে।

জানি। কম্পিউটারের পর্দায় দেখতে পাচ্ছি ওদেরকে।

কিভাবে?

তখন ডঃ থর্ন জানালেন স্টোরে যে কম্পিউটার চেক রেজিস্টার আছে ওটা খেটেখুঁটে চালু

করেছে কেলী। আর সারাহ্ তো জানেই গোটা দ্বীপ জুড়ে গোপন ক্যামেরার ছড়াছড়ি। কাজেই ভিডিওতে ওর প্রতিটি মুভমেন্ট দেখার সুযোগ ওদের হচ্ছে।

সারাহ্‌র গাড়ির চারদিকে ডাইনোসারগুলো ঘুর ঘুর করছে। ওদের শক্তিশালী পাগুলো শুধু দেখতে পাচ্ছে সারাহ্। গাড়ির নিচে ঢুকতে না পেরে অধৈর্যভাবে মাটিতে পা ঠুকছে। হঠাৎ হুড়োহুড়ি পড়ে গেল প্রাণীগুলোর মধ্যে। দলটা ছিটকে গেল। দৌড়াতে শুরু করল রাস্তার দিকে, কোন কারণে খুব ভয় পেয়েছে। ওদের এই আকস্মিক পলায়নের কোনো কারণ খুঁজে পেল না সারাহ।

সে রেডিওতে ডাকল। ডক্টর?

হুঁ।

ওরা চলে গেল কেন?

গাড়ির নিচে শুয়ে থাকো। বললেন থর্ন।

ডক্টর?

কথা বলো না। কেটে গেল লাইন।

চুপচাপ শুয়ে থাকল সারাহ্। ডক্টরের গলায় টেনশনের সুর টের পেয়েছে সে। কিন্তু জানে না কেন। হঠাৎ সে মৃদু একটা ঘরঘরে আওয়াজ শুনল। চোখ তুলে তাকাল সারাহ্। দুটো পা দেখা যাচ্ছে।

কাদামাখা বুটজুতো পরা পা জোড়া।

পুরুষের পা।

ভুরু কোঁচকাল সারাহ্। বুটজোড়া চিনতে পেরেছে সে, কাদায় লেপ্টে গেলেও খাকি ট্রাউজার জোড়াকে চিনতে ভুল হয়নি তার।

ওটা ডজসন।

এক্সপ্লোরার-এর দরজার দিকে এগোল বুটপরা পা জোড়া। দরজার ল্যাচ খোলার ক্লিক শব্দ শুনতে পেল সারাহ্।

গাড়িতে ঢুকছে ডজসন।

বিদ্যুৎ খেলে গেল সারাহ্‌র দেহে, কি করতে যাচ্ছে নিজেও জানে না, নাক দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে গড়ান দিল সে, হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরল ডজসনের দু'পায়ের গোড়ালি, টান দিল প্রাণপণে, চিৎকার করে মাটিতে আছাড় খেল ডজসন। ঘুরল সে সারাহ্‌র দিকে, মুখখানা রাগে টকটক করেছে। সারাহ্‌কে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল ডজসন। ওহ্ আবার তুমি! ভেবেছিলাম সাগরেই তোমাকে শেষ করে দিয়েছি।

রাগে আগুন ধরে গেল সারাহ্‌র গায়ে, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল গাড়ির তলা থেকে। ডজসন হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল, সারাহ্ মাত্র অর্ধেক শরীর বের করেছে, উঠতে যাচ্ছে, এই সময় ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল যেন ওখানে। থরথর করে হঠাৎ মাটি কাঁপার কারণটা সারাহ্ জানে ভালই। দেখল ডজসন ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়েছে, সাথে সাথে শুয়ে পড়ল মাটিতে। পড়িমরি করে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে শুরু করল সারাহ্‌র পাশে, গাড়ির নিচে।

বিশালদেহী একটা টাইরানোসার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। প্রতিটি পদক্ষেপে কেঁপে উঠল মাটি। ডজসন প্রাণপণে চেষ্টা করল গাড়ির তলে আশ্রয় নিতে, কিন্তু ওকে ভেতরে আসতে দিল না সারাহ্। সে দেখল ধারাল নখসহ বিরাট একটা পা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। প্রতিটির পা তিনফুট লম্বা। টাইরানোসারের গর্জন ভেসে এল কানে।

ডজসনের দিকে তাকাল সারাহ্। ভয়ে চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে লোকটার। টাইরানোসার আবার গর্জন করে মাথা নোয়াল। নিচের ঠোঁট স্পর্শ করল মাটি। ওটার চোখ দেখতে পেল না সারাহ্, শুধু নিচের চোয়াল। টাইরানোসারটা নাক কোঁচকাতে লাগল অনেক সময় নিয়ে।

ওদের গন্ধ শুঁকছে।

সারাহ্র পাশে নির্জলা আতংকে কাঁপতে শুরু করেছে ডজসন। কিন্তু সম্পূর্ন শান্ত রয়েছে সারাহ্। কি করবে জানা আছে ওর। দ্রুত একটা গড়ান দিল ও, গাড়ির পেছনের চাকা জড়িয়ে ধরল দু'হাতে। তারপর বুট পরা পা দিয়ে ঠেলতে শুরু করল ডজসনকে, বের করে দেবে গাড়ির তলা থেকে।

আতংকিত ডজসন রীতিমত ধস্তাধস্তি শুরু করল, চেষ্টা করল ভেতরে ঢুকতে, কিন্তু সে সুযোগ ওকে দিল না সারাহ্। ইঞ্চি ইঞ্চি করে সে ঠেলে ফেলে দিতে লাগল ডজসনকে। শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ডজসনের কাঁধে পা লাগিয়ে ওকে সরিয়ে দিতে থাকল গাড়ির তলা থেকে। শুনল টাইরানোসারটা গর্জন করছে। বিরাট পা খানাকে নড়ে উঠতে দেখল সে।

ডজসন চিৎকার করে বলল, তুমি পাগল হলে নাকি? করছ কি? থামো! থামো! কিন্তু থামল না সারাহ্। আগের মতই কাঁধে পা ঠেকিয়ে ডজসনকে ঠেলতে লাগল সে। ডজসন প্রাণপনে যুঝল, হঠাৎ ওর শরীরটা গাড়ির তলা থেকে সড়সড় করে বেরিয়ে যেতে শুরু করল।

সারাহ্ দেখল টাইরানোসারটা ডজসনের একটা পা কামড়ে ধরেছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে ডজসন সারাহ্র বুটজুতো চেপে ধরল, ওকেও সাথে টেনে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু মুক্ত পা'টা দিয়ে প্রচণ্ড এক লাথি কষাল সারাহ্ ডজসনের মুখে। ওর পা ছেড়ে দিল ডজসন। তারপর পিছলে বেরিয়ে গেল গাড়ির তলা থেকে।

ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেছে ডজসনের, হাঁ হয়ে আছে। তবে কোন চিৎকার বেরুলো না। ডজসন মাটি খামচে ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হল না কোনো। হঠাৎ চারদিকে অদ্ভুত নীরব হয়ে গেল। সারাহ্ দেখল ডজসন দলা-মোচড়া হয়ে তাকিয়ে আছে ওপরের দিকে। তার গায়ে প্রাগৈতিহাসিক দানবটার বিরাট ছায়া পড়ল। মাটিতে নেমে এল প্রকাণ্ড মাথাটা, ধারাল দাঁতের সারিসহ চোয়ালদুটো খোলা। কামড় বসাল ডজসনের গায়ে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ডজসন, পরক্ষণে ঝট করে উঠে গেল সে শূন্যে।

মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে, টাইরানোসারের চোয়ালে বন্দী হয়ে ঝুলতে থাকল ডজসন। যেকোন মুহূর্তে চোয়াল দুটো বন্দী হলেই প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হবে তার। কিন্তু বন্ধ হলো না চোয়াল দুটো।

শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ডজসন দেখল টাইনোসারটা জঙ্গলের দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

গাছের উঁচু ডালে বাড়ি খেল নাকমুখ, শরীর যেন ঝলসে গেল প্রাণীটার গরম নিশ্বাসে, লালায় ভিজে যাচ্ছে। আতংকে যে কোনো সময় জ্ঞান হারাবে ডজসন।

কিন্তু চোয়ালদুটো বন্ধ হল না।

ডজসনের চিৎকার মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সারাহ্। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ির তলা থেকে। দরজা খুলে হুইলের পেছনে বসল। ইগনিশন কি ধরে মোচড় দিল। মৃদু গর্জন তুলে চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন।

ডক্টর, রেডিওতে ডাকল সারাহ্।

হ্যাঁ, সারহা।

গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে। আমি আসছি এক্ষুণি।

ঠিক আছে, বললেন তিনি। তাড়াতাড়ি এসো।

গাড়ি চালানোর ঠিক আগে ট্রান্সমিশন গেল বন্ধ হয়ে। হঠাৎ থেমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। আর এ কারণেই সারাহ্ শুনতে পেল দূরাগত হেলিকপ্টারের ম্লান শব্দ।

বত্রিশ

সারাহ্ গাড়ি নিয়ে আসছে, এই আনন্দে যখন সবাই মশগুল, ঠিক সেই মুহূর্তে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে এলো ওদের ভাগ্যে। আক্রান্ত হলো ওরা ভয়ংকর হিংস্র র‍্যাপ্টরদের দ্বারা। কোত্থেকে কে জানে, দলে দলে র‍্যাপ্টর বেরিয়ে এল জঙ্গল ছেড়ে। চোখের পলকে ঘিরে ধরল স্টোরটাকে। শুরু করল হামলা।

জানালার ওপর আছড়ে পড়ল ওরা, ইস্পাতের গরাদে টোল ফেলে দিল ধাক্কার চোটে, কাঠের দেয়াল খামচাতে লাগল ধারাল নখ দিয়ে, কয়েক জায়গার কাঠ ভেঙ্গে ফাটল তৈরি হলো। সেকেণ্ডের মধ্যে নরক নামিয়ে আনল ওরা ওখানে।

ভয়ে আর আতংকে দিশেহারা বোধ করল সবাই। কেলী কম্পিউটার নিয়ে বসেছিল এখান থেকে বেরুবার কোনো রাস্তা আছে কি না খুঁজে দেখতে। কারণ ইনজেন কোম্পানীর গোটা নেটওয়ার্ক কম্পিউটারের সাহায্যে পরিচালিত হতো। খুঁজতে খুঁজতে কেলী এই বাড়ির এক প্রান্তে একটা বোট হাউজের সন্ধান পেয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে আরো কিছু তথ্য অনুসন্ধানের আগেই র‍্যাপ্টরদের হামলা হল। আকস্মিকভাবে ভয়ের চোটে সব তালগোল পাকিয়ে ফেলল কেলী। কারণ পাশের ঘরে ইতিমধ্যে দেয়াল ভেঙে ঢুকে পড়েছে র‍্যাপ্টররা। ঘরের জিনিসপত্র ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে ফেলছে। যে কোন সময় এ ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়তে পারে ওরা। আর একবার এ ঘরে ঢুকতে পারলে প্রাণে বাঁচবে না কেউ। ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে ওদেরকে হিংস্র, মাংসাশী প্রাণীগুলো।

বেঁচে থাকার আকুলতায় মরিয়া হয়ে উঠল কেলী। কম্পিউটারের বোতাম টিপতে লাগল একের পর এক। যদি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কোনো রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায়। ঠিক এই সময় মরার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মত সারাহ্র কল এল। সে জানাল যে হেলিকপ্টারটির ওদেরকে নিয়ে যাবার কথা ছিল, সেটি হেলিপ্যাডে কাউকে না পেয়ে চলে গেছে। না, সারাহ্ যথাসময়ে ওখানে পৌঁছতে পারেনি। শুনে প্রবল হতাশায় ভেঙে পড়ল সকলে। কিন্তু পাশের

ঘরের তাণ্ডব লীলা ওদেরকে মনে করিয়ে দিল ভয়াল এবং নির্মম মৃত্যু ওদের কাছ থেকে পাঁচ হাত দূরেও নেই।

বাঁচার কোনো আশা নেই জেনেও কেলী জোর করে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করল কম্পিউটারে। এবার ওকে সাহায্য করছে অসুস্থ আর্বি।

কাঠের দেয়ালটার এক জায়গায় আট ইঞ্চি ব্যাসের একটা গর্ত তৈরি হলো বিকট শব্দে। একটা র‍্যাপ্টর মুখ ঢুকিয়ে দিল গর্ত দিয়ে, গরগর করে দাঁত খিঁচাল কেলীর দিকে চেয়ে, ভয়ে আত্মা উড়ে গেল কেলীর। আর ঠিক তখন সে টানেলটার সন্ধান পেয়ে গেল কম্পিউটারের পর্দায়। ওর ডেস্কের ঠিক নিচ দিয়ে একটা তার চলে গেছে মেঝের দিকে, ঢুকেছে একটা গর্তে। ওখানে কাঠের একটা প্যানেল। প্যানেলটা ধরে টান দিতেই উঠে এল ওটা হাতে। নিচে তাকাল কেলী। গাঢ় অন্ধকার।

হ্যাঁ, এটা একটা টানেল। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাবার মত রাস্তা আছে।

কেলী চিৎকার করে বলল, এখানে!

দড়াম শব্দে রেফ্রিজারেটরটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে। সামনের দরজা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকল মাংসলোভী র‍্যাপ্টরগুলো। দেয়াল ভেঙ্গে ঢুকে পড়ল আরো কয়েকটা। লাফ ঝাঁপ শুরু করল ঘরের মধ্যে। আর্বির ভেজা কাপড় চোখে পড়ল ওদের। রাগের চোটে কড়কড় করে ছিঁড়ে ফেলল ওগুলো।

শিকারের নেশায় উন্মাদ হয়ে গেছে সবক'টা। কিন্তু হাতছাড়া হয়ে গেছে শিকার।

তেত্রিশ

হাতে ফ্লাশ লাইট নিয়ে আগে আগে চলেছে কেলী, পেছনে বাকিরা। স্যাঁতসেঁতে কংক্রিটের দেয়াল ধরে অন্ধকার টানেলের মাঝ দিয়ে হাঁটছে ওরা। জল আর গ্যাসের পাইপ ঝুলে আছে ছাদে, গা গোলানো একটা গন্ধ আসছে টানেল থেকে। পায়ের তলা থেকে ফুড়ুৎ ফাড়ুৎ দৌড় দিচ্ছে ইঁদুর।

দ্বিমুখী একটা রাস্তার ধারে চলে এল ওরা। ডান ধারে লম্বা, অন্ধকারে ঢাকা প্যাসেজ ওয়ে। সম্ভবত ল্যাবরেটরীর দিকে গেছে, ভাবল কেলী। বাঁ দিকে টানেলটা ক্রমশ শুরু হতে শুরু করেছে, শেষ মাথায় সিঁড়ি।

কেলী বাঁ দিকে এগোল।

সরু কংক্রিটের শ্যাফটের মাঝ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল সে, মাথায় কাঠের একটা ট্র্যাপডোর খুলল ধাক্কা দিয়ে। দেখল ছোট একটা ইউলিটি বিল্ডিংয়ে চলে এসেছে ওরা, তার আর জংধরা পাইপে বোঝাই। ভাঙ্গা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কেলী। দেখল স্যারাহ্ হার্ডিং পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে ওদের দিকে।

নদীর ধার ঘেঁষে এক্সপ্লোরার চালাচ্ছে স্যারাহ্, কেলী তার পাশে বসা। খানিক দূরে কাঠের একটা সাইনবোর্ড দেখল ওরা 'বোটহাউজ' লেখা। ওরা বোট হাউজের সামনে নিয়ে এলো গাড়ি।

বিল্ডিংটা ভাঙ্গা, লতা-পাতা যথেচ্ছভাবে বেড়ে উঠেছে চারপাশে। ছাদটার বিভিন্ন জায়গায় ঢেউ খেলে আছে। সারাহ্ এক্সপ্লোরার নিয়ে একজোড়া ডাবল দরজার সামনে চলে এলো। লাফিয়ে নামল সবাই গাড়ি থেকে। গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল প্যাচপেঁচে কাদায়।

এখানে সত্যি নৌকা পাওয়া যাবে? সন্দেহের সুর আর্বির গলায়।

লাথি মেরে দরজা ভেঙে ওরা ভেতরে ঢুকল। বেশ বড়সড় একটা নৌকা দেখতে পেল সবাই।

চমৎকার! আনন্দে হাততালি দিল লেভিন। এই নৌকা দিয়েই আমরা স্বচ্ছন্দে নদী পার হতে পারব। তারপর হোম হোম সুইট হোম।

চৌত্রিশ

আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল লুইস ডজসন। টাইরানোসার মুখ থেকে ফেলে দিয়েছে ওকে। শক্ত মাটিতে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা পেল ডজসন। কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখে আঁধার দেখল সে। তারপর বুঝতে পারল টাইরানোসার সেই মাটির ঘরে তাকে নিয়ে এসেছে যেখান থেকে ডিম চুরি করেছিল সে। বিকট একটা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল তার। কানে বিস্ফোরণের মত শোনাল তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার।

এক কনুইতে ভর করে আধশোয়া হল ডজসন। তিনটে ডাইনোসরের বাচ্চা ঘিরে আছে তাকে। একটার পায়ে অ্যালুমিনিয়ামের র‍্যাপার জড়ানো। এটাকেই হাওয়ার্ড কিং চাপা দিয়েছিল। পরে সারাহ্ হার্ডিং ওকে সুস্থ করে তোলে। অবশ্য এসব ঘটনা ডজসনের জানার কথা নয়। তিনটে বাচ্চাই ডজসনকে দেখে উত্তেজনায় হাঁক ছাড়ল।

ডজসন হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল, কি করবে বুঝতে পারছে না। একটা বিশালদেহী টাইরানোসার মাটির ঘরটার এক কোণে দাঁড়িয়ে গরগর আওয়াজ করছে। আর যেটা ওকে তুলে এনেছে সেটা তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

ডজসনের দিকে এগোতে শুরু করল বাচ্চাগুলো। ওদের নখ ছোট হলেও বেশ ধারাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড় দিল ডজসন। সাথে সাথে বড় ডাইনোসারটা ঝট করে মাথা নামিয়ে আনল, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ডজসনকে। আবার মাথা তুলল। ওটা অপেক্ষা করছে। দেখছে।

আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ডজসন, সাথে সাথে বাড়ি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। কিচমিচ করতে করতে বাচ্চাগুলো দৌড়ে এল ওর কাছে।

হঠাৎ ওর পা কামড়ে ধরল বড় টাইরানোসার, এক মুহূর্ত চুপচাপ থাকল। তারপর দাঁত বসিয়ে দিল, গুড়িয়ে গেল হাড়, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল মাংস।

ব্যথায় চিৎকার করে উঠল ডজসন। নড়াচড়া করতে পারছে না। মুখ হাঁ করে একের এক বিরতিহীন চিৎকার দিয়ে গেল শুধু। তিনটে বাচ্চা এবার একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর গায়ে। শুরু করল কামড়াকামড়ি। একটা বাচ্চা পা কামড়ে ধরে ছিঁড়ে আনল রক্তাক্ত মাংস, দ্বিতীয়টা লাফিয়ে উঠে ডজসনের কুঁচকির ওপর কামড় বসাল ক্ষুরের মত ধারাল দাঁতে।

তৃতীয় বাচ্চাটা এক কামড়ে থুতনীর মাংস ছিঁড়ে নিল। গুঙিয়ে উঠল ডজসন। দেখল

ওর মাংস পরম আয়েশে চিবাচ্ছে বাচ্চাটা। রক্ত পড়ছে চোয়াল বেয়ে। আবার কামড় দিল ওটা চিবুকে। আরেক গরাস মাংস খুবলে নিল। সব শেষে মুখ হাঁ করে বাচ্চাটা কামড় দিল ডজসনের ঘাড়ে।

....